ব্রিটিশ শিক্ষা সিলেবাস : পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও মুসলমানদের মনস্তাত্ত্বিক পরাধীনতা

মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, মসজিদুল আবরারে মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশের মাসিক আইম্মায়ে মাসাজিদের মজলিসে প্রদত্ত বয়ান।

হামদ ও সালাতের পর...
কুরআনে পাকে সূরা নিসার ৮০নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দিচ্ছেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলের অনুসরণ করল, সে আল্লাহকেই অনুসরণ করল।' অর্থাৎ আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সত্তা যে, তাঁর অনুসরণ আল্লাহরই অনুসরণ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন, আমি নবীজীর যবান থেকে যা-ই শুনতাম, মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে সব লিখে নিতাম। কিন্তু অন্যান্যরা আমাকে এ বলে নিবৃত্ত করলো যে, তুমি তো নবীজীর সব কথাই লিপিবদ্ধ করো! অথচ তিনিও তো একজন মানুষ। আলাপচারিতায় তিনি কখনো ক্রোধান্বিত হন, আবার কখনো ক্রোধমুক্তও থাকেন!

তাদের এ কথা শুনে আমি নবীজীর সব কথা লিখা হতে নিবৃত্ত হলাম এবং বিষয়টি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উত্থাপন করলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে নিজ জিহ্বা মুবারকের দিকে ইশারা করে বললেন,

اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ

অর্থ : তুমি আমার থেকে যা কিছুই শোনো, সব লিখতে থাকো। কেননা, ঐ পবিত্র সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! আমার এ যবান হতে সত্য ব্যতীত কিছুই বের হয় না! (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৬৪৬)

মানবজাতির হিদায়াতের পথ অনুসরণের জন্য আল্লাহ পাক অনেক নবী-রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সকলেই নিষ্পাপ ছিলেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিষ্পাপ ছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক হল, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও অপসংস্কৃতির প্রভাবে এবং তাদের অপপ্রচার ও প্রোপাগাণ্ডায় বিভ্রান্ত হয়ে অনেক মুসলমানও আজ নবী রাসূলগণের ব্যাপারে বিরূপ ধারণা পোষণ করে ঈমানহারা হয়ে যাচ্ছে। জনৈক চিন্তাবিদ তো আম্বিয়া আ. এর প্রতি দোষারোপ করে লিখেছে, 'শুধু আমাদের নবীই নয়, অন্যান্য নবীর দ্বারাও আল্লাহ তা'আলা কয়েকটা কবীরা গুনাহ করিয়েছেন।' (নাউযুবিল্লাহি)

মনে রাখতে হবে, নবীদের দোষচর্চা করা, সাহাবীদের দোষচর্চা করা গুনাহে কবীরা, লা'নত এবং গজবের কারণ।

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের নবীজী প্রত্যহ ১০০ বার ইস্তিগফার করতেন। কিন্তু নবীজীর এই ইস্তিগফার গুনাহের কারণে ছিল না। এর কারণ ছিল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বিভিন্ন ধরনের মানুষের যাতায়াত ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের আছর ও প্রভাব তাদের উপর পড়ত এবং তাদেরও কিছু কিছু আছর ও প্রভাব নবীজীর উপর পড়ত। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিলের মধ্যে এক ধরনের অন্ধকার ভাব অনুভব করতেন। সে অন্ধকার ভাব দূর করার জন্যই তিনি দৈনিক ১০০ বার ইস্তিগফার করতেন। এজন্য দাওয়াতের সাথে সাথে ইস্তিগফারও জারি রাখতে হবে। অন্যথায় গুনাহগার মাখলুকের বদ-তাসীরে একসময় দাঈর দিলও শক্ত হয়ে যাবে, তারও আমল ছুটে যাবে। উদাহরণত কোন ব্যক্তি যদি সারাদিন খাওয়া-দাওয়া করে, কিন্তু মেসওয়াক না করে, তাহলে তার দাঁতে ময়লা জমে একপর্যায়ে নষ্ট হয়ে যাবে। তদ্রূপ গুনাহগার মাখলুকের সোহবতে নেককার বান্দাদের দিলের মধ্যেও কিছু ময়লা জমে। আর সে ময়লা দূর হয় ইস্তিগফার দ্বারা।

যাহোক, সূরা নিসার ৮০নং আয়াতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণকে আল্লাহর অনুসরণ সাব্যস্ত হয়েছে। সূরা শু'আরাতেও অনেক নবীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যেক নবী দুনিয়াতে এসে প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়েছেন,

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

অর্থ : আমি তোমাদের জন্য আমানতদার রাসূল (অর্থাৎ উম্মতের অনেক বড় আমানত নবীগণের উপর ন্যস্ত)। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে অনুসরণ করো। (সূরা শু'আরা-১০৭-১০৮)

সুতরাং আমাদের কাজ হল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করা, বিনা বাক্যব্যয়ে তার কথা মেনে চলা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নমুনা বানিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : আমার রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম নমুনা রয়েছে।

আমাদের দায়িত্ব হল রাসূলের অনুসরণ শেখা এবং আমল করা। তবে তা শুধু নামাযের মধ্যেই সীমিত নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে। মোচ কেমন হবে, দাড়ি কী পরিমাণ লম্বা রাখতে হবে, বগলের নিচের পশম, নাভির নিচের লোম কত দিনের মধ্যে পরিষ্কার করতে হবে, পুরুষদের পাজামা-লুঙ্গি টাখনুর নিচে থাকবে না উপরে থাকবে, মুসলমানেরা কীভাবে থাকবে, কীভাবে খাবে ইত্যাদি।

হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কুরআনে কারীমের এ আদেশ যথাযথ পালন করেছেন। তারা পূর্ণাঙ্গরূপে নবীজীর অনুসরণ করেছেন এবং পরবর্তীদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব কিছু আমল করে দেখিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের যিন্দেগীতে তালাশ করলে নবীজীর অনুসরণ দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের লেবাস-পোশাক, চেহারা-সূরত অন্যান্য জাতির মত। অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

من تشبه بقوم فهو منهم

অর্থ : যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, হাশরের ময়দানে সে তাদের সঙ্গে থাকবে। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৫১১৫)

অন্য হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন,

لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى قال فمن

যার সারকথা হল, আমার উম্মতের উপর এমন এক যামানা আসবে, যখন তাদের চাল-চলন ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের মত হবে, বিধর্মী কাফেরদের ন্যায় হবে। বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে মেপে তারা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের অনুসরণ করবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৪৫৬)

কাফের-বিজাতীয়দের এ অনুকরণ ও অনুসরণের নেপথ্য কারণ হলো, মুসলমানদের মনস্তাত্ত্বিক পরাধীনতা, যা সৃষ্টি হয়েছে ব্রিটিশ শিক্ষা সিলেবাসের কারণে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন টিকিয়ে রাখার জন্য নিজেদের সাংস্কৃতিক দাস তৈরির উদ্দেশ্যে খ্রিস্টানরা সারা পৃথিবীতে তাদের শিক্ষা সিলেবাস চালু করেছে। দু'শ বছরের শাসনের পর উপমহাদেশের ভূমি ছেড়ে যাওয়ার সময়ও ব্রিটিশরা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভিত মজবুত করে গেছে। তাদেরই রচিত শিক্ষা সিলেবাস আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হচ্ছে। আমাদের সন্তানরা এই সিলেবাসের বিষক্রিয়ায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারছে না। তারা কখনো খ্রিস্টানদের চাল-চলন, কখনো খেলোয়াড়দের চাল-চলন, কখনো সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের চাল-চলন গ্রহণ করে। সন্তানকে খ্রিস্টান স্কুলে ভর্তি করায়, অথচ কোন মুসলমান তার সন্তানকে খ্রিস্টান স্কুলে ভর্তি করার অর্থ হল, গার্জিয়ান কর্তৃক স্যারকে একথা বলে দেয়া যে, 'স্যার! আপনি যেমন বেঈমান হয়েছেন, আমার সন্তানটাকেও আপনার মত পাক্কা বেঈমান বানিয়ে দিবেন।' অথচ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন,

كنتم خير أمة اخرجت للناس

অর্থ : হে মুসলমানের সন্তানগণ! তোমরাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দুনিয়াবাসীর মঙ্গলের জন্য পাঠিয়েছেন। (সূরা আলে ইমরান- ১১০)

অর্থাৎ তোমরাই দুনিয়াবাসীকে জান্নাতের রাস্তা দেখাবে, তাদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাবে। আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ঘোষণা করছেন দুনিয়াতে মুসলমানরাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমাদের সন্তানরা ব্রিটিশ সিলেবাসের প্রভাবে আমাদের চেয়ে খ্রিস্টানদেরকে শ্রেষ্ঠ ও সভ্য জাতি ভাবছে। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে কুরআনের এ সকল আয়াত শিখাইনি। তাদেরকে একথা বুঝাইনি যে, আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণের ন্যায় আমাদেরকেও বিশ্ববাসীর হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন; আমরা কোনো জাতির গোলাম নই। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শই সর্বোত্তম আদর্শ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কোন বিষয়ে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের মুখাপেক্ষী করে যাননি। ইয়াহুদ নাসারারা তো ফরয গোসল পর্যন্ত জানে না। হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না। স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মীয় কিতাবও বিকৃত করে। শুকর-কুকুরকে হালাল মনে করে।

খাদ্য ও আহার গ্রহণ করার মধ্যেও নবীজীর অনুসরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র রয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আজ নবীজীর অনুসরণ আমাদের মাঝে চরমভাবে উপেক্ষিত।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 'খাওয়ার সময় উভয় হাত কব্জিসহ ধুয়ে বিসমিল্লাহ পড়ে তোমার দিক থেকে শুরু করো'। (সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৫২১২)

হাদীসের শব্দ كل مما يليك তোমার দিক থেকে খাও। 'তোমার দিক' এ কথার মধ্যেই এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, এক প্লেটে কমপক্ষে দুইজন হতে হবে। কেননা একজন একা বসলে পুরোটাই তো তার দিক, আরেকজন হলে তবে না 'তোমার দিক' বলা সঠিক হবে। কেননা তখন প্রত্যেকেরই 'দিক' থাকবে। কিন্তু এ অঞ্চলের মানুষের যাপিত জীবনে একসময় হিন্দুত্বের প্রভাব ছিল অনেক বেশি। তখন মুসলমানের নামের সঙ্গেও 'শ্রী' লেখা হতো। জমা-জমির পুরনো দলীল-পত্রে এখনও মুসলমানের নামের শুরুতে 'শ্রী' শব্দ পাওয়া যায়। তারপর কিছু আল্লাহর বান্দা নামের শুরুতে 'মুহাম্মাদ' লাগিয়ে 'শ্রী' লেখার প্রথা বন্ধ করে দিয়েছেন। পূর্বপুরুষগণের কারণে হিন্দুয়ানী স্বভাব-সংস্কৃতি এখনো আমাদের সমাজে রয়ে গেছে। যেমন হিন্দুধর্মের অস্পৃশ্য সংস্কৃতির একটি দৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া হল পরিবারের প্রত্যেকের প্লেট, গ্লাস ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। একজন আরেকজনের জিনিস ব্যবহার করা হিন্দু ধর্মে কবীরা গুনাহর মত অপরাধ। ধুতি পরিধান করা, কাঁকড়া খাওয়া, মৃত্যুর ৪০ দিন পর কুলখানি করা ইত্যাদি অযৌক্তিক আনুষ্ঠানিকতাও আমাদের সমাজে হিন্দু ধর্ম থেকে এসেছে। হিন্দুরা মৃত্যুর ৪০ দিন পর 'শ্রাদ্ধ' খাওয়ায়। মুসলমানদের মধ্যে কুলখানির প্রথা হিন্দুদের শ্রাদ্ধ খাওয়ানোর প্রথা থেকে উদ্ভূত। এসব প্রথা এখনও মুসলমানদের মধ্যে থাকা বড় দুঃখজনক। মুসলমানদের জন্য তা পরিত্যগ করা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামের মধ্যে পুরোপুরি দাখেল হও। (সূরা বাকারা- ২০৮)

আমাদের অনেক ইংরেজি শিক্ষিত ভাই, যাদের দাওয়াত ও তাবলীগ কিংবা উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে কোনো দীনী মেহনতের সাথে সম্পর্ক নেই, উলামায়ে কেরামের মজলিসে আসা-যাওয়া নেই, দীনী কোনো সোহবত তারা পাননি– খ্রিস্টানদের সঙ্গে তারাও শুকর-কুকুর খায়, মদ পান করে। অথচ ইসলামে শুকর খাওয়া আর তাজা পায়খানা খাওয়া, মদ পান করা আর তাজা পেশাব পান করা একই কথা, কোন পার্থক্য নেই। এভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 'তোমরা বিঘতে বিঘতে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের অনুসরণ করবে' বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উলামায়ে কেরাম ইংরেজি শেখাকে হারাম বলেন না; বরং ইংরেজি শিখতে গিয়ে ইংরেজ হয়ে যাওয়াকে নিষেধ করেন। তাঁরা ইংরেজি শিখতে বলেন দাওয়াতের নিয়তে, হালাল চাকুরীর নিয়তে। এতে আল্লাহ তা'আলা সওয়াব দান করবেন। ইংরেজি শিখতে গিয়ে ইংরেজ হওয়া যাবে না, তাদের চাল-চলন গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু কথায় আছে, 'যে যায় লংকায় সে-ই হয় হনুমান।' অনুরূপ যে-ই ইংরেজি শিখতে যায় সে-ই ইংরেজ হয়ে যায়।

প্রাইমারীতে সম্পূর্ণ মারে না, 'প্রায় মারে' অর্থাৎ অর্ধেক মারে। মানে হল, প্রাইমারীতে পড়া অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে আদায় করতো, টাখনুর উপর কাপড় পরতো, মুরুব্বীদেরকে শ্রদ্ধা করতো, বসে পেশাব করতো। কিন্তু যত উপরের ক্লাসে উঠে,

নামায ছাড়তে থাকে, টাখনুর নিচে কাপড় পরতে শুরু করে, দাঁড়িয়ে পেশাব করতে শেখে, মুরুব্বীদেরকে সালাম দেয়া বন্ধ করে দেয়, দাড়ি কেটে ঈমানের আলামত নষ্ট করতে থাকে, বাম হাত দিয়ে খায়। অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে বাম হাত দিয়ে খেতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, 'বাম হাত দিয়ে খেয়ো না। কেননা বাম হাত দিয়ে শয়তান খায়।' (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩২৬৮)

বাহ্যিকভাবে শয়তানের অনুসরণ করলে, কাফের মুশরিকদের অনুসরণ করলে ভেতরটাও তাদের মত হয়ে যায়। বাম হাত দিয়ে খানা খেলে, চায়ের কাপ বা গ্লাস বাম হাত দিয়ে ধরলে শয়তানের মতো অহংকার পয়দা হয়। শয়তান যেমন অহংকারের কারণে হযরত আদম আ. কে সিজদা করতে পারেনি বাম হাত দিয়ে যারা খায় তারাও আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের সামনে মাথা নত করতে পারে না।

ব্রিটিশ সিলেবাসের বিষফলে আক্রান্ত হয়ে আজ আমরা দিবস পালন নামে কাফেরদের অনুসরণের আরো একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছি। ইসলামে দিবস পালন বলতে কোনো সংস্কৃতি নেই। আমরা **১২ই** রবিউল আউয়াল পালন করি। জন্ম দিবস, মত্যু দিবস, বিবাহ দিবস, ভালোবাসা দিবস পালন করি। ওরশ করি। শবে বরাতসহ বিভিন্ন দিনে আলোকসজ্জা করি। এর কোনটি হিন্দুদের জন্মাষ্টমী থেকে, কোনটি খ্রিস্টানদের বড়দিন থেকে, আবার কোনটি অগ্নিপূজকদের থেকে এসেছে। আমরা খুঁজে খুঁজে বিজাতীয় সংস্কৃতি ইসলামে ঢুকিয়ে দিয়েছি। খ্রিস্টানদের মত চুল রাখছি। তাদের মত চেহারা-সূরত বানাচ্ছি। টাই পরছি। টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করছি। টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারীর উপর আল্লাহ তা'আলা এমন নারায হন যে, হাদীসে এসেছে, হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা তার দিকে তাকাবেন না, তার গুনাহও মাফ করবেন না। (শুআ'বুল ঈমান হা.নং ৫৭২৬)

বর্তমানে আমাদের দেশে 'ভালোবাসা দিবস' পালিত হয়। যা সম্পূর্ণ খ্রিস্টানদের কালচার। ভালোবাসা তো পিতা-মাতা, সন্তানাদি এবং বিবির সাথে হবে। এসব ভালোবাসা শরীয়তসম্মত। হাদীস শরীফে এসেছে, 'মহব্বত করে বিবির মুখে একটা লোকমা তুলে দিলে, আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে যান। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৬)

ব্রিটিশ সিলেবাসের ফলে সামাজিক অবক্ষয়ের আরেকটি দিক হলো ইসলামের অন্যতম ফরয পর্দার বিধান নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং নারী সমাজের মাঝে পাশ্চাত্যের নষ্ট অনুকরণের মানসিকতা তৈরি হওয়া। উদাহরণ পেশ করছি। ইসলামে অধিক বয়স্কা মহিলাদের চেহারার পর্দার বিষয়টি কিছুটা শিথিল। হাদীসে পাওয়া যায়, অধিক বয়স্কা মহিলাদের সঙ্গে হযরত আবূ বকর রাযি. মুসাফাহা করতেন। (নাসবুর রায়াহ ৪/২৪০, দিরায়াহ ২/২২৫)

কিন্তু অধিক বয়স্কা বৃদ্ধার ক্ষেত্রেও চুলের পর্দার হুকুম মৃত্যু পর্যন্ত পূর্ববৎ বহাল থাকে। খ্রিস্টানরা এনজিওদের মাধ্যমে প্রথমেই মহিলাদের মাথা অনাবৃত করে দিয়েছে। দোহাই দিচ্ছে, মাথায় কাপড় রাখলে মাথা গরম হয়ে যায়। তার ছেলেদের মাথায় তুলে দিচ্ছে শক্ত মোটা টুপি (ক্যাপ)। এতে আর ছেলেদের মাথা গরম হয় না। অথচ মেয়েদের মাথায় ওড়না থাকলে নাকি মাথা গরম হয়ে যায়! মনে রাখতে হবে, সব বয়সী নারীদের জন্যই চুল ঢেকে রাখা আবশ্যক। চুলের পর্দা বয়সের তারতম্যের কারণে কোন অবস্থাতেই শিথিল হয় না। যদিও চেহারার পর্দার বিষয়টি একপর্যায়ে শিথিল হয়ে যায়। যেমন অধিক বৃদ্ধা নারীদের চেহারার পর্দার শিথিলতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থ : যে সকল বৃদ্ধা নারীদের বিবাহের কোনো আশা নেই, তাদের জন্য এতে কোনো গুনাহ নেই যে, তারা নিজেদের (বাড়তি) কাপড় (বহির্বাস, গাইরে মাহরাম পুরুষের সামনে) খুলে রাখবে, সৌন্দর্য প্রদর্শনের ইচ্ছা ব্যতিরেকে। আর যদি তারা সাবধানতা অবলম্বন করে (গাইরে মাহরামের সামনে বহির্বাসও গায়ে জড়িয়ে রাখে) তবে সেটাই তাদের পক্ষে শ্রেয়। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শোনেন এবং সকল বিষয় জানেন। (সূরা নূর- ৬০)

পাশ্চাত্যের শিক্ষা সিলেবাসের পাঠ গ্রহণ করে বিজাতীয়দের অনুকরণপ্রিয় হয়ে আমাদের সমাজব্যবস্থা কেবল পর্দা বিধানই উঠিয়ে দিচ্ছে না; বরং এ সমাজ এখন উদার ও খোলা মনোভাবের নামে বেহায়াপনার শিকার হয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে বিবাহবন্ধন সামাজিক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর বিপরীতে বয়ফ্রেন্ড/গার্লফ্রেন্ড সংস্কৃতি স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছে। একাধিক বিবাহ তো তাদের কাছে রীতিমত গর্হিত ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

মনে রাখতে হবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ের পূর্বে বেগানা মহিলার সাথে ভালোবাসার সম্পর্কের কোনো অবকাশ নেই। কোনো মেয়ে কোনো ছেলের বান্ধবী হতে পারে না। বান্ধবী নামে কোন আত্মীয় ইসলামে নেই। বেগানা মহিলার সাথে ভালোবাসা করা মানে তাকে যিনার পার্টনার বানানো। তাকে দেখা চোখের যিনা, স্পর্শ করা হাতের যিনা, তার দিকে হেঁটে যাওয়া পায়ের যিনা, তাকে নিয়ে জল্পনা কল্পনা করা মনের যিনা। আমাদের ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়তে গিয়ে একে অপরকে বয়ফ্রেন্ড/গার্লফ্রেন্ড বানায়, ফলে তারা সার্বক্ষণিক যিনার মধ্যে লিপ্ত থাকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো মেয়ে তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া একাকী গাইরে কুফুতে বিবাহ করলে বিবাহই সহীহ হয় না। কুফু হল, দীনদারী, মালদারী, বংশমর্যাদা ইত্যাদির দিক থেকে ছেলে-মেয়ে সমান থাকা। ভালোবাসা করে কোর্টে গিয়ে বিবাহ করলে নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়। উপরন্তু কুফুর মিল না থাকায় এ ধরনের **১২** আনা বিবাহই শরীয়তসম্মত হয় না। কাজেই বিবাহপূর্ব ভালোবাসা সম্পূর্ণ হারাম।

আমাদের সমাজের অনেক মহিলার স্বামী মারা যায়, তালাক প্রাপ্তা হয়, তারা আর দ্বিতীয়বার বিয়ে বসে না। বিয়ের কথা বললে উত্তর দেয়, 'বিয়ে তো জীবনে একবারই হয়।' এটা কুফরী কথা। যা পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত। এ ধরনের কথা বললে ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। শরীয়তে একথার কোন অস্তিত্ব নেই। শরীয়তের কথা কারো বুঝে না আসলে সে পোড়া-কপালী। কাজেই 'বিয়ে জীবনে একবারই হয়' এ ধরনের কুফরী কথা বললে পুনরায় কালিমা পড়ে ঈমান আনা উচিত। কোন মহিলার **১০** বার বিবাহ ভেঙ্গে গেলে **১১**তম বারও তার বিয়ে বসার অবকাশ ইসলামে রয়েছে।

আমাদের দেশে কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করলে তাকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়। অথচ যার জরুরত আছে, আর্থিক সামর্থ্য আছে, বাহ্যিক ইনসাফ তথা স্ত্রীদের মাঝে সমতা বজায় রাখতে পারে, তার

জন্য একাধিক বিবাহ করা আল্লাহ তা'আলার হুকুম মতে জায়েয। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

অর্থ : তোমরা তোমাদের পছন্দমত দু' দু'টি, তিন তিনটি, চার চারটি বিবাহ কর। (সূরা নিসা- ৩)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একটি বিবাহের কথা উল্লেখই করেননি। বরং দুথটি থেকে চারটি পর্যন্ত বিবাহের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ মহিলারা প্রত্যেক মাসে ৭/১০ দিন অপবিত্র থাকে। অনেক পুরুষ এই দীর্ঘ সময় ধৈর্যধারণ করতে পারে না। তাদের জন্য ইনসাফ করার শর্তে একাধিক বিবাহের অনুমতি রয়েছে। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর দু'জন বিবি ছিলো। তিনি খানকায় একটা দাড়িপাল্লা রেখেছিলেন। বাজার থেকে দু'টো তরমুজ আনলেও প্রতিটি তরমুজ দু'ভাগ করে এটা থেকে এক অংশ আর ওটা থেকে এক অংশ মিলিয়ে পাল্লা দিয়ে মেপে সমান দু'ভাগ করে দুই বিবির ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। একটি তরমুজ এক ঘরে আরেকটি অন্য ঘরে পাঠাতেন না। কেননা হতে পারে, একটা মিঠা আর আরেকটা পানসে। কাজেই সর্বাবস্থায় একাধিক বিবাহকে ঘৃণার চোখে দেখা এবং এক বিবাহের উপর সন্তুষ্ট থাকার প্রবণতা খ্রিস্টানদের থেকে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। খ্রিস্টধর্মে পত্নী হয় একজন, উপপত্নী হয় অনেকজন। অর্থাৎ তারা বলে 'পত্নী তো একজনই হয়।' আর এদিকে আমরা বলি, 'বিবাহ তো জীবনে একবারই হয়।' কোন বুযুর্গ যদি একাধিক বিবাহ করে তাহলে জনসাধারণের দৃষ্টিতে তার বুযুর্গী খতম হয়ে যায়। অথচ খ্রিস্টানদের কুপ্রথা ভাঙ্গার কারণে এটা তার নাজাতের উসীলা হতে পারে।

খ্রিস্টানরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকে জটিল এবং সীমিত করে যিনা-ব্যভিচারের পথকে সুগম করেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম দায়িত্বের সঙ্গে বিবাহের পথকে নিষ্কণ্টক করে যিনার পথকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা আজ খ্রিস্টানদের প্রোপাগাণ্ডার শিকার হয়ে যিনা-ব্যভিচারের পথেই সমাজকে নিয়ে যাচ্ছি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের হাতে মেহেদী লাগানোর তাকীদ করেছেন। যাতে হাত দেখেই মহিলা-পুরুষের পার্থক্য বোঝা যায়। একবার হযরত আয়েশা রাযি. এর নিকট উপবিষ্ট এক মহিলার হাতের উপর নবীজীর নজর পড়েছিল। তার হাতে মেহেদী লাগানো ছিল না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি পুরুষের হাত দেখছি, না মহিলার হাত? (তাফসীরে কুরতুবী; সূরা নিসা- ১১৯)

মোটকথা, কোন অপারগতা না থাকলে সব বয়সী মহিলাদের হাতে মেহেদী থাকতে হবে, চুড়ি থাকতে হবে। আমাদের দেশের শিক্ষিত মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়ে খ্রিস্টানদের অনুসরণে হাতে চুড়িও পরে না, মেহেদীও লাগায় না। আর অশিক্ষিত মেয়েরা শিক্ষিতদের দেখাদেখি তাদের মত চলতে চায়। পাশ্চাত্যের অনুকরণের নিয়তে মহিলাদের হাতে চুড়ি না থাকা, মেহেদী না থাকা হারাম। কারণ খ্রিস্টানদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে,

من تشبه بقوم فهو منهم

অর্থ : যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করলো, তার হাশর সে জাতির সাথেই হবে।

কিছু মুর্খ মহিলা মনে করে বিয়ের আগে চুড়ি পরতে নেই। কোন মেয়ে পরলে সকলে মিলে তাকে তিরস্কার করতে থাকে। দুই ধরনের ভুল সমাজে প্রচলিত আছে। কেউ মনে করে চুড়িই পরা যাবে না। আর কেউ মনে করে বিয়ের আগে চুড়ি পরতে নেই।

অনুরূপভাবে ইসলামের বিধান হল, স্বামীর সামনে পর্দার প্রয়োজন নেই। গাইরে মাহরামের সাথে পর্দা করতে হবে। এর বিপরীতে হিন্দু ধর্মের রীতি হল, বিয়ের আগে মহিলাদের মাথা খালি রাখতে হয়, আর বিয়ের পরে ঢাকতে হয়। বিশেষ করে স্বামীর সামনে ঘোমটা দিতে হয়। হিন্দুদের অনুকরণে আমাদের মা বোনদের মাঝেও ইসলাম বিরোধী রীতি পরিলক্ষিত হয়।

উল্লিখিত বড় বড় বিষয়গুলো ছাড়াও আরো অনেক বিষয়েই আজ আমরা নবীজীর সুন্নাতের অনুসরণ বাদ দিয়ে কাফের-মুশরিকদের অনুসরণ করছি, যা মূলত ব্রিটিশ সিলেবাসে শিক্ষা অর্জন এবং এর অনিবার্য পরিণতিতে পাশ্চাত্যের মনস্তাত্ত্বিক গোলামীর বিষফল। যদি বর্তমানের মুসলিম সমাজব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় তবে এ জাতীয় ফালতু অনুসরণের আরো বহু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা আরো কিছু বিষয়ের শুধু শিরোনাম উল্লেখ করছি।

মুসলমান পুরুষরা যে সকল বিষয়ে কাফের মুশরিকদের অনুসরণ করছে তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো-

- কোট-প্যান্ট ও টাই পরা।
- টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরা।
- পাঞ্জাবির সাথে ওড়না পরা।
- হাফপ্যান্ট পরা।
- ধুতি পরিধান করা।
- হাতে চুড়ি জাতীয় বস্তু পরা।
- স্বর্ণের অলংকার ও আসবাব-পত্র ব্যবহার করা।
- অভিনেতা-অভিনেত্রী বা সেলিব্রেটিদের স্টাইলে চুল কাটা।
- দাড়ি মুণ্ডানো বা স্টাইল করে কাটা এবং মোচ বড় রাখা।
- দাঁড়িয়ে পেশাব করা।
- বিবাহের পূর্বে 'গার্লফ্রেন্ড' বানানো।
- গলায় চেইন পরাসহ বিভিন্ন দিক দিয়ে নারীর সাদৃশ্য অবলম্বন করা।

আমাদের মুসলমান মা বোনেরা যে সকল বিষয়ে কাফের মুশরিকদের অনুসরণ করছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- টাইটফিট কাপড় ও পাতলা কাপড় পরা।
- চুড়ি না পরা এবং হাতে মেহেদী না দেয়া।
- কপালে টিপ দেয়া।
- অফিস, ব্যাংক ও মার্কেটের রিসিপশনের দায়িত্ব পালন করা।
- পুরুষদের সঙ্গে চাকরী করা।
- পণ্যের বিজ্ঞাপনে মডেল হওয়া।
- বিবাহের পূর্বে 'বয়ফ্রেন্ড' বানানো।
- পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করত তাদের মত প্যান্ট-শার্ট পরা, ঘাড় পর্যন্ত বাবরী রাখা, চুলে বব কাটিং দেয়া।
- নখ বড় রাখা।

শ্রেণীবিশেষের এ অনুকরণের পাশাপাশি সম্মিলিত মুসলিম সমাজও আজ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বিভ্রান্ত হয়ে আছে। এ সকল বিভ্রান্তির মধ্যে অন্যতম কয়েকটি বিভ্রান্তি হলো-

- একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত চেয়ার-টেবিলে খানা খাওয়া বা খাওয়ার অভ্যাস করা।
- বাম হাতে খাওয়া বা পান করা।
- চামচের প্রয়োজন নেই- এমন জায়গায় চামচ দিয়ে খাওয়া।
- খাবারের শেষে প্লেট চেটে খাওয়াকে অভদ্রতা মনে করা এবং প্লেটে খাবারের কিছু অংশ রেখেই উঠে যাওয়া।

➢ অভিনেতা-অভিনেত্রী, খেলোয়াড় ও সঙ্গীত শিল্পীদের ছবিওয়ালা গেঞ্জি বা শার্ট পরিধান করা।
➢ বেপর্দা ও গান-বাজনাসহ বিবাহের অনুষ্ঠান করা।
➢ বিয়েতে গায়ে হলুদ ও 'বধূবরণ' অনুষ্ঠান করা।
➢ ক্রুশের ছবিওয়ালা পণ্য ব্যবহার করা।
➢ শখ করে কুকুর পালা।
➢ শোক প্রকাশে নীরবতা পালন করা।
➢ মাযারে বা প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা।
➢ মাযারে মোমবাতি জ্বালানো ও আলোকসজ্জা করা। ফুল দেয়া, সিজদা করা, মান্নত করা, প্রার্থনা করা।
➢ বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দেয়া। মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো।
➢ মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা।
➢ জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, শোক দিবস, বার্থডে, ম্যারেজ ডে, থার্টিফার্স্ট নাইট, পহেলা বৈশাখ, নববর্ষ, ভলোবাসা দিবস, হোলি উৎসব ইত্যাদি পালন করা।
➢ ঘরে-বাইরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভাস্কর্য বা মূর্তি স্থাপন করা।
➢ আল্লাহ না বলে 'সৃষ্টিকর্তা', 'গড', 'ভগবান' বা 'ঈশ্বর' বলা।
➢ বিশেষ কোন উপলক্ষে কেক কাটা ও উইশ করা। হাই-হ্যালো, ওকে, টাটা, গুডবাই, গুডমর্নিং ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সাক্ষাত ও বিদায়ী সম্ভাষণ জানানো। মুসাফাহার পরিবর্তে 'হ্যান্ডশেক' করা।
➢ বড় ভাইকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করা।
➢ সন্তানকে 'বেবি কেয়ারে' রেখে আসা। বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো।
➢ ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং দীনী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকা। সহশিক্ষা গ্রহণ করা।

এ জাতীয় অসংখ্য বিষয়ে আজ আমরা কাফেরদের অনুসরণ করছি। অথচ হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

خالفوا اليهود والنصارى والمشركين

অর্থ : তোমরা ইয়াহুদ, নাসারা, মূর্তিপূজক এবং অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা কর।

বদনামের পরওয়া করো না। আমাদের শরীর, লেবাস- পোশাক, খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি সব কিছুর দিকে তাকালে দেখা যায়, আমরা ১২ আনাই কাফের-মুশরিকদের অনুসরণ করি আর মাত্র ৪ আনা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করি। অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ১৬ আনাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এটাই সর্বোত্তম তরীকা, খোদা প্রদত্ত জীবনাদর্শ। ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের কিতাবেও লেখা আছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব, হযরত উমর রাযি. ন্যায়পরায়ণ খলীফা। বস্তুত কোনো জাতির মধ্যেই উমর রাযি. এর মত দক্ষ ও নিষ্ঠাবান সেনাপতি পয়দা হয়নি।

মাইকেল এইচ হার্ট নামক এক খ্রিস্টান পৃথিবীর ১০০ মনীষীর জীবনী সংকলন করতে গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রথম স্থান দিতে বাধ্য হয়েছে। যদিও এই বইয়ের উপর আমরা সন্তুষ্ট নই। কেননা, যদি বলা হয়, মুফতী সাহেব হুযূর; বিড়াল, কুকুর ও শিয়ালের মধ্যে মুফতী সাহেব শ্রেষ্ঠ। তাহলে মুফতী সাহেবকে আসলে সম্মানিত করা হল না; বরং বিড়াল, কুকুর এবং শিয়ালের সাথে তুলনা করার কারণে অসম্মান করা হল। অতএব এ বইয়ের মধ্যে কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে তুলনা করার কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ধরনের অসম্মান করা হয়েছে। কাফের মুশরিকদেরকে তো আল্লাহ তা'আলা সূরা আ'রাফের ১৭৯নং আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু থেকেও নিকৃষ্ট বলেছেন। এদের সাথে রাসূলের তুলনা করলে কি প্রশংসা হলো? অতএব এ বইয়ের প্রথমে নবীজীকে উল্লেখ করার দ্বারা বড়াই করার কিছু নেই।

যা হোক স্বল্প সময়ে সবকথা বলা তো সম্ভব নয়। এখানে নমুনা স্বরূপ মুসলিম সমাজে কাফের-মুশরিকদের অনুসরণের কিছু চিত্র পেশ করা হল এবং এ অনুসরণের মূল কারণ যে ব্রিটিশের শিক্ষা সিলেবাস তা-ও উল্লেখ করা হল। আপনারা উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে অল্প অল্প করে জেনে নিবেন যে, আমরা আমাদের জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে নবীজীর তরীকা অনুসরণ করি আর কোন কোন ক্ষেত্রে কাফের-মুশরিকদের তরীকা মেনে চলি। তারপর হিম্মত করে বর্জনীয় বিষয়গুলো বর্জন করা শুরু করে দিন। বিশেষ করে ব্রিটিশ বিষবৃক্ষ (শিক্ষা সিলেবাস) থেকে সতর্ক থাকুন। অর্থাৎ স্কুল কলেজে পড়ুয়া সন্তানদেরকে সময়-সুযোগ করে উলামায়ে কেরামের মজলিসে নিয়ে আসুন। উলামায়ে কেরামের সোহবতে তাদেরকে দীনী মানসিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করুন। বার্ষিক পরীক্ষার পর তাবলীগে পাঠিয়ে দিন। ইনশাআল্লাহ বিষবৃক্ষের ক্ষতি থেকে আপনার সন্তান বেঁচে যাবে। বর্তমান যামানায় তাবলীগ জামাআত আল্লাহ তা'আলার বিরাট রহমত। এর সঙ্গে যে ব্যক্তি সহীহভাবে জুড়ে গেছে ইনশাআল্লাহ তাকে কেউ বেঈমান বানাতে পারবে না।

তাবলীগ ও দাওয়াতুল হকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটা হল এক পাখির দুই ডানা বা এক সাইকেলের দুই চাকা অথবা একটি পাইকারী মার্কেট, আরেকটি খুচরা মার্কেট। দাওয়াতুল হক থেকে শিখবেন, দাওয়াত ও তাবলীগে গিয়ে তা বিতরণ করবেন। উভয় মেহনতের মুরুব্বী হলেন হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.। অথবা এভাবে বুঝুন, জামাআতের ওয়াপেসী কথার মধ্যে মারকায থেকে হিদায়াত দেয়া হয় যে, 'দেখুন, শুধুমাত্র চিল্লার দ্বারা পূর্ণাঙ্গ দীনদার বনা যায় না। আমরা আপনাদেরকে কেবলমাত্র দীনের সাথে জুড়ে দিলাম। এখন দীনের অন্যান্য বিষয়গুলো এলাকায় গিয়ে হক্কানী উলামায়ে কেরামের সঙ্গে উঠা-বসা করে করে শিখে নিবেন।' মারকাযের এই হিদায়াত থেকে বোঝা গেল, প্রত্যেক এলাকায় হক্কানী উলামায়ে কেরাম থেকে দীন শেখার একটা সিস্টেম থাকতে হবে। ঐ সিস্টেমের নামই হল দাওয়াতুল হক। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাবলীগের নিসবতে অনেক সময় লাগানোর তাওফীক দিয়েছেন। ছাত্র জীবনেও, মুফতী হওয়ার পরেও। আরব জামাআতের অনেক তরজুমানীও আল্লাহ তা'আলা আমাকে করার তাওফীক দিয়েছেন।

আমাদের রাহমানিয়ার ছাত্র, শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ সকলেই তাবলীগওয়ালা। অধিকাংশ শিক্ষক সালওয়ালা। ছাত্রদের জন্য কানূন হল, এক বন্ধে বাড়ির এলাকায় সময় লাগাবে, আরেক বন্ধে দাওয়াত ও তাবলীগে সময় লাগাবে। এই মাদরাসা একই সঙ্গে ইলমের মারকায, দাওয়াতের মারকায এবং আত্মশুদ্ধিরও মারকায। ঘর একটা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে একটি ঘর দিয়ে দীনের বিভিন্ন ধরনের খেদমত নিচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ব্রিটিশ সিলেবাসের বিষফল থেকে সতর্ক থাকার তাওফীক দান করুন এবং উলামায়ে কেরামের সোহবত, দাওয়াত ও তাবলীগ এবং দাওয়াতুল হকের সঙ্গে জুড়ে থেকে দীনের মেহনত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শ্রুতিলিখন : ইসমাতুল্লাহ (ইফতা-প্রথম বর্ষ)
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

দিকনির্দেশনামূলক বয়ান

উলামায়ে কেরামের জন্য দীনী খিদমত ছাড়া জীবিকা উপার্জনের অন্য উপায় অবলম্বন

মুফতী সাঈদ আহমাদ

গত ৮ই মার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার ৫ম বার্ষিক সম্মেলনে আবনায়ে রাহমানিয়ার উদ্দেশ্যে জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার নায়েবে মুফতী, রাবেতা সম্পাদক মুফতী সাঈদ আহমাদ ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এক সারগর্ভ বয়ান পেশ করেছিলেন। এটি তার অনুলিখন।

-সম্পাদনা সহযোগী

প্রিয় আবনায়ে রাহমানিয়া এবং সম্মানিত মেহমানবৃন্দ! যে বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে– উলামায়ে কেরাম দীনী খিদমতের পাশাপাশি আয়-উপার্জনের পৃথক কোন ফিকির করবে কিনা, করলে কিভাবে করতে হবে– এ বিষয়ে দু'চারটি কথা বলার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাকেও আমল করার তাওফীক দান করুন, শ্রোতাদেরকেও তাওফীক দান করুন, আমীন। বিষয়টি সহজে বোঝার সুবিধার্থে কয়েকটি ঘটনা বলছি।

ঘটনা–১

দারুল উলূম করাচিতে শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা.বা. এর তিরমিযী শরীফের এক ইখতিতামী দরসে আমরা শরীক ছিলাম। দরসের একপর্যায়ে তিনি কিছু নসীহত করলেন। নসীহতের একটা অংশ ছিল এই–

'তুম যরিআয়ে মা'আশ কি ফিকর না কারনা। বলকে দীন কি খিদমত কি ফিকর কারো, আল্লাহ তা'আলা তুমহারে মাআশ কে লিয়ে কাফি হো জায়েঙ্গে। আল্লাহ তা'আলা কুত্তুঁ কো খিলাতে হেঁ, তুম কেয়া সমঝ রাহে হো কে, তুম দীনকে খাদেম হো আওর তুমহেঁ নেহি খিলায়েঙ্গে!'

আল্লাহ তা'আলা কুকুরকেও খাওয়ান, তোমরা তার দীনের খিদমত করবে আর তোমরা ধারণা করছো যে, তিনি তোমাদেরকে খাওয়াবেন না?। এজন্যই হযরত বলেছেন, 'তুম যরিয়ায়ে মাআশ কি ফিকির না কারনা।'

ঘটনা–২

জামি'আ রাহমানিয়ায় শিক্ষক হিসেবে তাকাররুরের (নিয়োগপ্রাপ্তির) কিছুদিন পর আমার বিবাহের সিদ্ধান্ত হয়। আমার আগ্রহ ছিল, আকদটা যেন হযরত শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ছাহেব রহ. পড়ান। আমার শ্বশুর ছিলেন ফরিদাবাদ মাদরাসার উস্তাদ। বাড়ি কুমিল্লার দয়াপুরে। হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব রহ. এর একজন প্রিয় উস্তাদ হযরত মাওলানা সিকান্দার ছাহেব রহ.এর বাড়িও ছিল দয়াপুরে। হযরত শাইখুল হাদীস রহ. প্রায়ই উস্তাদের বাড়িতে যেতেন এবং তাঁর পুকুরে মাছ ধরতেন। হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব রহ.এর সঙ্গে আমার শ্বশুরের পরিচয় ছিল। শ্বশুর ছাহেব আমার আগ্রহের কথা জানতে পেরে হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব রহ. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমার ছোট মেয়ের বিবাহ হবে। ছেলে তো আপনাদের ওখানের উস্তাদ। তার আগ্রহ, বিবাহটা আপনি পড়ালে ভাল হবে। আপনি যদি আমার বাড়িতে আসতে রাজি হন তাহলে আমার ভাতিজা অমুক মাওলানাকে বলে দেবো, সে তার গাড়ি পাঠিয়ে দিবে। এই মাওলানা ছাহেব হলেন নারায়ণগঞ্জের এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। সম্পর্কে আমার শ্বশুরের ভাতিজা। মাওলানা ছাহেব নিজেও একজন যোগ্য আলেমে দীন এবং বাংলাদেশের প্রথম সারির আলেমে দীন ফরিদাবাদ মাদরাসার এক সাবেক মুহতামিম সাহেবের পুত্র। এদিকে মাওলানা সাহেবের শ্বশুর ছিলেন নারায়ণগঞ্জের আরেক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনিও একজন যোগ্য আলেমে দীন ছিলেন। যা হোক, এই মাওলানাদ্বয় সেখানে গেঞ্জির কারখানা চালাতেন। বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবাদে প্রথম মাওলানা ছাহেব তখন একাধিক গাড়ি-বাড়ির মালিক। তো আমার শ্বশুর শাইখুল হাদীস ছাহেব রহ. কে প্রস্তাব করেছেন যে, আপনি রাজি হলে ভাতিজাকে গাড়ি পাঠাতে বলবো, আপনি ওর গাড়িতে চলে আসবেন। হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব রহ. মাদরাসায় এসে আমাকে ডাকালেন। বললেন,

– 'তর নাকি মাওলানা আতিক সাবের মেয়ের সাথে বিয়া ঠিক হইছে?'

– 'জ্বী, কথাবার্তা হইছে এরকম।'

– 'আতিক সাব তো আমার সাথে দেখা করছিলো। কইল, আমি যাইতে চাইলে অমুকরে নাকি বইলা দিব, তার গাড়িতে চইলা যামু।'

এরপর হুযূর বললেন,

– 'দ্যাখ্ আমি দু'আ কইরা দিমু, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হইবো না– এই হইল এক কথা। দুই নম্বর হইল, আমি আসলে ওর গাড়িতে উঠতে চাই না। কারণ, ও আর ওর শ্বশুর দুয়োজন আমার ছাত্র। এগোর উপ্রে আমার খুব জিদ লাগে। এই কারণে যে, এরা দুয়োজন বুখারীর উস্তাদ হইতে পারতো। কিন্তু এরা বুখারীর উস্তাদ হওয়া বাদ দিয়া গেঞ্জির ব্যবসা করে, আমার এদেরকে দেখতেও ইচ্ছা করে না।'

ঘটনা–৩

আমার আব্বা লালবাগ মাদরাসা হতে ফারেগ হওয়ার পর হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর রহ. এর পরামর্শে ফরিদাবাদ মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেছেন। হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর রহ. তাকে বলেছিলেন, এখনই তুমি লালবাগ মাদরাসায় উস্তাদ হলে তোমাকে নিচের দিকের কিতাব দেয়া হবে, যেহেতু তোমার উস্তাদরা এখানে আছেন। এক কাজ করো তুমি ফরিদাবাদ চলে যাও। এখন ওখানে পড়াতে থাকো, পরে কোন সময় লালবাগে আসলে ভালো ভালো কিতাব পাবে। ফরিদাবাদ মাদরাসা তখন মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর রহ. এর তত্ত্বাবধানে চলত। ফরিদাবাদের গঠনতন্ত্র ছিল, যিনি লালবাগ মাদরাসার মুহতামিম হবেন পদাধিকার বলে তিনি ফরিদাবাদের মুতাওয়াল্লী থাকবেন। সে হিসেবে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর রহ. ছিলেন ফরিদাবাদের মুতাওয়াল্লী। সুতরাং কাউকে উস্তাদ হিসেবে নিয়োগ

দিতে চাইলে তাকে কারও কাছে জিজ্ঞেস করতে হতো না। তিনি আব্বাকে পাঠিয়ে দিলেন। আব্বাও হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ.এর পরামর্শে সেখানে শিক্ষকতা করতে লাগলেন। এদিকে কচুয়ার প্রসিদ্ধ গ্রাম করইশের অধিবাসী আব্বার এক হামসবক (সহপাঠী) ছিলেন। তিনিও আলেমে দীন ছিলেন। সে মাওলানা ছাহেবের ব্যবসার প্রতি খুবই ঝোঁক। তিনি বন্ধু হিসেবে আব্বাকেও তার কিতাবের ব্যবসায় শরীক করে নিলেন। দুই বন্ধু মিলে শিরকতের ভিত্তিতে দোকান খুললেন ধুপখোলা মাঠের পাশের গলিতে। তো আব্বার বন্ধু মাওলানা ছাহেব খুব মনোযোগ দিয়ে ব্যবসায় বসেন। আর মাদারাসায় দরস-তাদরীসের পর আব্বার আর দোকানে বসার আর সুযোগ হয় না। ফলে এ নিয়ে তার ও আব্বার মধ্যে যেমন মনকষাকষি চলছে, অপরদিকে দোকানেরও খুব একটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। আব্বা তখন ফরিদাবাদের মুহতামিম হযরত মাওলানা বজলুর রহমান ছাহেব রহ. এর সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, হযরত এই হল ব্যবসার অবস্থা। ব্যবসারও কোন উন্নতি দেখছি না, পাশাপাশি বন্ধুত্বের মধ্যেও ফাটল দেখা যাচ্ছে, এখন কী করি? হযরত বজলুর রহমান ছাহেব রহ. পরামর্শ দিলেন যে, দেখো, দুই নৌকায় দুই পা দিয়ে চালানো যায় না। তোমাকে আল্লাহ তা'আলা পড়ানোর যোগ্যতা দিয়েছেন তুমি পড়া-পড়ানো নিয়েই থাকো, দোকানদারী বাদ দাও। মুহতামিম সাহেবের পরামর্শে আব্বা দোকানদারী বাদ দিয়ে দিলেন। আব্বা আলাদা হওয়ার পরেও মাওলানা ছাহেব আরও কিছুদিন সেখানে বইয়ের ব্যবসা করেছেন। পরে আমরাও দেখেছি যে, তিনি শেষ পর্যন্ত কাটাবন মসজিদের নিচে যে বইয়ের দোকানগুলো আছে এখানে একটা বইয়ের দোকানে দোকানদারী করতেন। এখন কোথায় হারিয়ে গেছেন আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। আলহামদুলিল্লাহ! মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেবের পরিচয় তো এখনো বাকি আছে। লালবাগ মাদরাসায় এখনো আছেন, সেখানে পড়াচ্ছেন। পক্ষান্তরে যিনি ইলমে দীনের খিদমত বাদ দিয়ে দোকানদারীতে লিপ্ত হয়েছেন তিনি এখন ইতিহাসের কোন উল্লেখযোগ্য অংশ নন। আমার আব্বাও যদি সেদিন বন্ধুর আবদারে দোকানদারীতে বেশি মনোযোগী হতেন তাহলে হয়তো তার ইতিহাসও এমনটিই হতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মুরুব্বীর পরামর্শ মানার মধ্যে এই খায়ের রেখেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকেও দীনের খিদমতের জন্য কবুল করেছেন এবং সে উছিলায় আমাদেরকেও দীনের খিদমতের সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছেন।

আমার আব্বা যখন লালবাগ মাদরাসায় অসেন, তখন কামরাঙ্গীরচর, ইসলামবাগ ওসব এলাকায় শুধু পানি আর পানি। মনে পড়ছে, লালবাগ মাদরাসায় আমি যখন প্রথম আসি– দেখার জন্য, পড়ার জন্য নয়; পড়ার বয়স হয়নি তখনও। আব্দুল করীম নামে এক ভাই ছিলেন। তার পিতা লুঙ্গির ব্যবসা করতেন। ওই আব্দুল করীম ভাই তাদের বাসায় আমাদেরকে দাওয়াত দিলেন। লালবাগ মাদরাসার কাছেই তাদের বাসা। তিনি আমাকে কাঁধে করে তাদের বাসায় নিয়ে গেলেন। তাদের বাসা ছিল পানির ওপর। বাঁশের খুঁটির ওপর কাঠ দিয়ে মাচা বাঁধা। বলার উদ্দেশ্য হল, লালবাগ মাদরাসার একটু পরেই আশপাশের পুরো এলাকা ছিল বিশাল জলাশয়। বর্ষা মৌসুমে বুড়িগঙ্গার পানিতে পুরো এলাকা থৈ থৈ করতো। তখন অনেকেই আব্বাকে বলতেন, এই কামরাঙ্গীরচরে, ইসলামবাগে কত লোকেই তো জমি কেনে, আপনিও একটু কিনে রাখলে সমস্যা কোথায়? আপনি এখানে খাজে দেওয়ানে আছেন। মহল্লার কত লোকের সঙ্গেই তো আপনার পরিচয়। দরকাল হলে কিছু করয নিয়েই দু'চার কাঠা জায়গা কিনেন। পরে আস্তে আস্তে পরিশোধ করবেন। ছেলে পেলে আছে, তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তাও তো আপনাকে করতে হবে। তাদের জন্য তো কিছু করে যেতে হবে। আব্বা তাদেরকে জবাব দিতেন, ভবিষ্যৎ হিসেবে আমি ছেলেপেলেদের জন্য ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমির চিন্তা করছি না, ভবিষ্যৎ হিসেবে আমি তো ছেলেপেলেদের ইলমে দীনের চিন্তা করছি। আমি চাই তারা ইলমে দীন হাসিল করুক। তারা যদি ইলমে দীন হাসিল করে এবং তাতে সফল হয় তাহলে তাদের ঘর-বাড়ির চিন্তা আমাকে করতে হবে না।

তো আমরা আমাদের মুরুব্বীদের কাছ থেকে শুনে, তাদেরকে দেখে যেটা উপলব্ধি করেছি তা হল, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ইলমে দীনের খিদমতের যোগ্যতা দিয়েছেন, তাদের জন্য পৃথক কোন যারিয়ায়ে মা'আশের ফিকির করার আদৌ কোনও প্রয়োজন নেই। হযরত তাকী উসমানী মু.যি.এর সেই কথা আবারও স্মরণ করছি–

'তুম দীন কি খিদমত কি ফিকির কারো, আল্লাহ তা'আলা তুহমারে দুনিয়াবী জরুরিয়াত কি কাফালত কারেঙ্গে। আল্লাহ তা'আলা কুত্তুঁ কো খিলাতে হেঁ, তুমহেঁ নেহি খিলায়েঙ্গে, কেয়া সমঝতে হো তুম?'

মোটকথা কারও যদি দীনের খিদমত করার যোগ্যতা থাকে, ইলমে দীনের যতটুকু ইস্তিদাদ ও যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করেছেন এটা এতো বিরাট ও বিশাল পুঁজি যে, এই পুঁজি পেয়ে তালিবে ইলমদের খিদমত ছাড়া অন্য ব্যবসায় লিপ্ত হওয়া তার জন্য মানায় না। উদাহরণত কারো মালিকানায় হীরার খনি আছে। আর সে হীরার ব্যবসা বাদ দিয়ে ছাইয়ের ব্যবসা শুরু করল।

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী হযরত সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা.বা. তার দরসে বুখারীর এক ইখতিতামী মজলিসে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে তাদরীসের খিদমতের তাওফীক দিয়েছেন, চাই সেটা যে কোন বিভাগেই হোক– ইবতেদায়ী মারাহিলেই হোক, মকতবে হোক, নাযেরায় হোক, হিফয পড়ানোর জন্য হোক, কিতাব বিভাগের জন্য হোক– মোটকথা যে কোন বিভাগেই হোক আল্লাহ তা'আলা যাকে ইলমী খিদমতের যোগ্যতা দান করেছেন সে যদি খিদমতের এই পেশা বাদ দিয়ে অন্য কেনা পেশা অবলম্বন করে তাহলে তার দৃষ্টান্ত হল কুরআনে কারীমের এই আয়াত وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا সারাদিন লাগিয়ে সে সুন্দর করে রশি পাকাল, সুতা কাটল আর বিকেল বেলা সব ছিন্ন-ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। তো আল্লাহ তা'আলা তাকে ইলমে দীনের মহামূল্য পুঁজি দান করলেন। কিন্তু এত এত সুন্দর পুঁজি তার হাতে আসার পর যদি সে দীনের খিদমত বাদ দিয়ে অন্য পেশায় জড়িয়ে পড়ে তাহলে তার সঙ্গে কুরআনে বর্ণিত ঐ মহিলার কি পার্থক্য আছে, যে কিনা সারাদিন লাগিয়ে সুতা পাকাল আর বিকেল বেলা নিজ হাতে সব ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলল, নষ্ট করে ফেলল?! কাজেই ইলমে দীনের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক কোনভাবে হয়ে গেছে, তাদের জন্য পৃথক কোন যারিয়ায়ে মাআশের ফিকির করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা ইজ্জতের সঙ্গেই তার দুনিয়াবী সমস্ত

জরুরতের কাফালাত করবেন। এতে কোনও সন্দেহ নেই, সন্দেহের সুযোগও নেই।

তাছাড়া দীনী খিদমতের সঙ্গে মাসকানাত ও গুরবতকে (দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনকে) পাশাপাশি রাখার জন্য হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলেছেন।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি.কে যখন ইয়ামানের গভর্নর করে পাঠানো হচ্ছিল– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ 'বিলাসিতা পরিহার করবে। কারণ আল্লাহর বান্দারা বিলাসী হয় না।' (মুসনাদে আহমদ হা.নং ২২১০৫)

বিলাসিতাই যখন যিন্দেগীর মাকসাদ হবে না তখন অল্প অর্থ-কড়িতেই জীবন আরামসে কেটে যাবে।

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন, اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة

হযরত আয়েশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, لم يا رسول الله؟ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন দু'আ কেন করছেন যে, আপনি মিসকীন হিসেবে থাকবেন, মিসকীন হিসেবে মরবেন এবং মিসকীনদের মধ্যেই যেন আপনার হাশর হয়? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا এই কারণে যে, মিসকীনরা ধনীদের চল্লিশ বছর আগেই জান্নাতে চলে যাবে। (সুনানে তিরমিযী; হা. নং ২৩৫২)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, পাঁচশত বছর আগে জান্নাতে চলে যাবে।

হযরত আবুদ্দারদা রাযি. বলেছেন, যদি দামেশকের জামে মসজিদের সামনে এমন ব্যবসার সুযোগ থাকে, যে ব্যবসা করে এক ওয়াক্ত নামাযও কাযা হবে না এবং প্রতিদিন চল্লিশ দীনার করে সদকা করা যাবে তবুও আমি সে ব্যবসা করব না। সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করলেন, এত সুবর্ণ ব্যবসা অপনি কেন ছাড়বেন? তিনি জবাব দিলেন, যেহেতু ব্যবসার হিসাব নিকাশ হবে এবং হিসাব নিকাশ দিতে দিতে পাঁচশত বছর পিছিয়ে যেতে হবে। এজন্য আমি ঐ ঝামেলায় জড়াতে চাই না।

উলামায়ে কেরাম হলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের উত্তরসূরী; নায়েবে নবী এবং সাহাবায়ে কেরামের পদচিহ্ন অনুসরণকারী। কাজেই তারা যিন্দেগীকে কিছুতেই বিলাসী বানাবে না; অল্পেই তুষ্ট থাকবে এবং অল্প বোঝা নিয়েই দুনিয়ার এই পথ পাড়ি দেয়ার নীতি গ্রহণ করবে। ইমাম গাযালী রহ. বলেন, অধিক সম্পদে যে ব্যক্তি খুশি হয় সে আসলে গাধা। কারণ পশুর মধ্যে ভারি বোঝা নিয়ে একমাত্র গাধাই স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। শুনেছি, গাধাকে প্রথমে ইটের উপর দাঁড় করানো হয়, তারপর তার উপর বোঝা চাপাতে থাকতে হয়। যতক্ষণ না বোঝার চাপে পায়ের নিচের ইট ফেটে যাবে ততক্ষণ সে জায়গা থেকে নড়বে না। কারণ ওর চিন্তা হল, বোঝা বহন করার জন্যই যখন আমাকে বানানো হয়েছে তাহলে বোঝা দিতে থাকুক– যত দেয় ততই ভালো। এজন্য ইমাম গাযালী রহ. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার মাল ও আসবাব বৃদ্ধি পেলে খুশি হয় সে হল গাধা। কারণ গাধারা সামান বড় হলে খুশি হতে থাকে। দুনিয়ার চীজ-আসবাবও তো একটা বোঝা। আমরা এই বোঝার ভার অহেতুক কেন স্বীকার করব। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের আহমকী থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

হযরত পালনপুরী দা.বা. উলামায়ে কেরামকে কয়েক প্রকারে ভাগ করেছেন। এক প্রকার হল, তারা কোন মাদরাসায় ছিল ঠিক, কিন্তু কেবল ক্লাসই ডিঙ্গিয়েছে; না তার আরবীতে যোগ্যতা আছে, আর না আছে উর্দূতে। অর্থাৎ কোন যোগ্যতাই নেই। তিনি বলেছেন, মাদরাসা থেকে বের হওয়ার পর এরা যে কাজে ইচ্ছা লেগে যাক। মুয়াযযিনী করুক, ইমামতি করুক, হালাল উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করুক, কোন বাধা-নিষেধ নেই।

আরেক শ্রেণী হল, তাদের উর্দূতে যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। তবে আরবীতে কিছুটা কাঁচা। তাদের করণীয় হল, তারা আরবীতে পাকা-পোক্ত হওয়ার জন্য টানা দু'বছর এমনভাবে মেহনত করবে, যেন আরবীর যোগ্যতা হাসিল হয়ে যায়। তারপর সে ইলমে দীনের খিদমতে লেগে যাবে।

আরেক প্রকার হল, তাদের আরবী-উর্দূ উভয়টিরই যোগ্যতা আছে। এদেরকে আবার তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন। (১) যারা খুবই ভালো যোগ্যতা রাখে। তাদের উচিত হল, তারা দশ বছর একনাগাড়ে ইলমে দীনের খিদমত করবে। এ সময় অন্য কোন কাজে লিপ্ত হবে না। দশ বছর পূর্ণ হয়ে গেলে তারপর যা ইচ্ছা হয় করবে। (২) এর নিচের স্তরের ভালোরা পনেরো বছর নিজেদেরকে দীনী খিদমতে নিয়োজিত রাখবে। এই পনেরো বছর অন্য কোন কাজে মশগুল হবে না। তারপর ব্যবসা-বাণিজ্য, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে চাইলে সময় দিতে দিতে পারবে। (৩) আর তৃতীয় স্তরের লোকেরা টানা বিশ বছর সময় লাগাবে।

এখন তোমরা নিজেরাই ফয়সালা করো যে, তুমি কোন স্তরের আলেম। যদি উচ্চ স্তরের যোগ্যতাসম্পন্ন হও তাহলে হযরতের পরামর্শ অনুযায়ী আমরাও তোমাকে পরামর্শ দেব, তুমি দশ বছর তাদরীসের শোগল ছাড়া অন্য কোন শোগল এখতিয়ার করতে যাবে না। এই দশ বছরে তোমার পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ী যে কেউ নারাজ হোক তুমি তোমার মেহনতে অটল জমে থাকবে। মনে করো এ সময় তুমি তাদেরকে পর্যাপ্ত হাদিয়া দিতে পারলে না, স্ত্রী-সন্তানকে দামী কাপড়-চোপড় দিতে পারলে না এবং নিজেও ঠাটবাটের সাথে চলতে পারলে না– কোন অসুবিধা নেই। দশ বছর চোখ-কান বন্ধ করে তাদরীসের খিদমত করো। দশ বছর পর তাদরীসের সঙ্গে তোমার এমন এক গভীর সম্পর্ক তৈরি হবে যে, এরপর আর তোমার ব্যবসা-বাণিজ্য, ওয়াজ-মাহফিল, পীরগিরী, তাবলীগী কাজ তোমাকে তোমার তাদরীস থেকে সরাতে পারবে না। এখানে তোমার ভিত্তি মজবুত হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় স্তরের হলে এই মজবুতী আনার জন্য তোমাকে পনেরো বছর সময় দিতে হবে। আর আরেকটু দুর্বল হিম্মতের হলে বিশ বছর সময় দিতে হবে। বিশ বছর পর তোমাকে ছেড়ে দেয়া যাবে যে, এবার তুমি ব্যবসা করলে করতে পারো। দেখবে যে, তখন আর তোমার হয়ত ব্যবসা করতে মনই চাইবে না। আর চাইলেও এই ব্যবসা তোমার কিংবা তোমার প্রতিষ্ঠানের কোন ক্ষতি করবে না।

আমরা যে সকল উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে জানি যে, তাদেরও ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, মনে রাখবে, তারাও কিন্তু প্রথম জীবনে যুগ-দেড় যুগ ধরে মজবুতভাবে জমে থেকে ইলমে দীনের খিদমত করেছেন। আমাদের সামনে যাত্রাবাড়ির হযরত আমীরুল উমারা সাহেব এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লোকমুখে শুনি, তিনি দেশের একজন উল্লেখযোগ্য করদাতা। তার মানে হল, তিনি একজন

বিরাট ব্যবসায়ীও বটে। তার নিজেরই কোটি কোটি টাকার ব্যবসা আছে। এই যে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা তিনি যদি এর পরিচালনা করেও থাকেন, নিঃসন্দেহে তার জীবনে এমন একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত হয়েছে যে, তার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। এরই ফলে এখন শত কোটি টাকার ব্যবসাও তাকে তার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে একটুও সরাতে পারেনি। সুতরাং তোমাদেরও কারো যদি ব্যবসার আগ্রহ থাকে তাহলে তোমার প্রতি, আবনায়ে রাহমানিয়ার সকল ফাযেল এবং আমাদেরকে যারা মহব্বত করেন তাদের সকলের প্রতি হযরত পালনপুরী দা.বা. এর পরামর্শ অনুযায়ী আমাদেরও আরয থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ইলমে দীনের যে পুঁজি দান করেছেন সে পুঁজির যেন অবমূল্যায়ন না হয়। আল্লাহ না করুন, এই পুঁজির অবমূল্যায়ন হলে এই ব্যবসা বাদ দিয়ে অন্য ব্যবসায় বা কাজে লেগে গেলে তোমাদের পরিণতিও হয়ত তাই হবে, যেটা আমি দুই নম্বর ঘটনায় উল্লেখ করেছি যে, হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব রহ. নারায হয়ে বললেন, এরা বুখারী পড়াতে পারতো; আমার ছাত্র এরা! আমার কাছে বুখারী পড়েছে! কিন্তু এরা বুখারী পড়ানো বাদ দিয়ে ব্যবসা করছে। প্রিয় ছাত্ররা! খোঁজ নিয়ে দেখো, এখন তাদের অবস্থা কি? তাদের অবস্থা হল, তাদের পর্যন্ত তো লেবাস-পোশাক ঠিক আছে। কিন্তু তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জীবনে ইলমে দীন তো দূরের কথা, দীনই নেই। শুনেছি, তাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রত্যেকের বাসায় রুমে রুমে টেলিভিশন, গাড়িতে টেলিভিশন। শুধু এতটুকুই নয় যে, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম নষ্ট হয়ে গেছে, দীন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বরং ইলমে দীনের অবমূল্যায়নের কারণে স্বয়ং তাদেরও চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন চলে এসেছে। শুনি, এখন খোদ তারাও দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের দীনী খিদমতকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, আর ডা. জাকির নায়েক ও জামায়াতে ইসলামীর খিদমতকে খুব বড় করে দেখে। অর্থাৎ তারাও বুদ্ধি-বিকৃতির শিকার হয়ে গেছেন। যদি তাই হয় বল, তাহলে এটা কিসের পরিণতি? যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বুখারী পড়ানোর যোগ্যতা দিয়েছিলেন, যদি তারা এই যোগ্যতাকে কাজে লাগাতেন তাহলে হয়ত এ ধরনের বুদ্ধি-বিকৃতির শিকার হতেন না। পাশাপাশি ছেলেপেলেদের মধ্যেও দীনদারী থাকতো, তাদেরও দু-চারজন আলেম হত। কিন্তু তাদের মধ্যে এখন আলেমের নাম-গন্ধও নেই। বোঝা গেল, কেউ যদি ইলমে দীনের ভরপুর পুঁজি লাভ করার পরও এটা দিয়ে দীনী খিদমতের পরিবর্তে চার পয়সার পেছনে পড়ে যায়, তাহলে সেটা যত নেক সুরতেই হোক না কেন– উদাহরণত, মাদরাসা কায়েম করব, মাদরাসা পরিচালনা করব, উস্তাদদের বেতন দিব, দীনের অন্যান্য খিদমত করব, কেউ জান দিয়ে করে কেউ মাল দিয়ে করে; আমি না হয় মাল দিয়েই করব– জেনে রেখো, এগুলো সব নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা।

এজন্য আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ইলমে দীনের সম্পৃক্ততা নসীব করেছেন তারা জীবিকা অর্জনের ফিকির মোটেই করবে না। বরং ইলমে দীনের যে পুঁজি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করেছেন সে পুঁজি দ্বারা তারা পরকালের ব্যবসা করার নিয়ত করবে এবং সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন হলে একাধারে দশ বছর, মধ্যম পর্যায়ের হলে পনের বছর আর নিম্ন পর্যায়ের হলে বিশ বছর ইলমে দীনের খিদমত করতে থাকবে। এ সময় অন্য কোন ফিকির করবে না। করলে দীনও বরবাদ হবে, দুনিয়াও বরবাদ হবে।

আজকের যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়টি খুবই জটিল। এ যুগের ব্যবসা সাহাবা যুগ বা তাদের পরবর্তী যুগের ব্যবসা নয়। এখনকার ব্যবসার ময়দান এতটাই জটিল কুটিল যে, কারো যদি দীনের ওপর কঠিন মজবুতী না থাকে তাহলে তার পদস্খলন অনিবার্য। এ যুগের ব্যবসায় দীনদার কোন ব্যক্তি কেবল এতটুকু জড়িত হতে পারে যে, তার সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক হবে– ধরি মাছ না ছুঁই পানি। এরচে বেশি হলে এই ঘূর্ণাবর্ত হতে সে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারবে না। সে দুনিয়া-আখিরাত দুটোই বরবাদ করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে।

আমাদের পরিচিত এক মুরুব্বী এম.পি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাকে বললাম, আপনি তো ইলেকশন করতে পারবেন না। তিনি বললেন, কেন পারব না, আপনাদের হুযূরদেরও তো দেখি ইলেকশন করে?! আমি তাকে তার মত করেই জবাব দিলাম যে, আপনি তো আর হুযূর নন। তিনি বললেন, তাহলে বলুন, পারব না কেন? বললাম, ইলেকশনের ময়দানে এখন এত টাউট-বাটপারের সমাগম যে, আপনি এখনো সে পরিমাণ টাউট হতে পারেননি। ফলে আপনার পক্ষে ইলেকশন করা সম্ভব নয়। কিছুদিন পর দেখা গেল, যা বলেছিলাম তা-ই ঘটেছে। বেশ কিছু টাকা-পয়সা নষ্ট করে তারপর এসে বলছেন, হুযূর! আপনি যেটা বলেছেন সেটাই ঠিক। আসলেই আমার পক্ষে ইলেকশন করা সম্ভব নয়। তো অবস্থা বাস্তবতা হল, বর্তমানের ব্যবসা-বাণিজ্যে এত বেশি পরিমাণে টাউট-বাটপারি চলে যে, ঐ পরিমাণ টাউট হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে তুমি ওখানে গেলে হারিয়ে যাবে। দীনী পুঁজিও হারাবে, দুনিয়াবী পুঁজিও হারাবে। দুটোই তোমার হাতছাড়া হবে। এজন্যই এই ফিকির শুরুতে না করা উচিত।

আমাদের কিছু ভাই ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন। তারা যেন এর ওপর খুশি না হয়ে যান; বরং কদম কদম যেন এ ব্যাপারে আশঙ্কা করেন যে, যে কোন সময় স্খলন ঘটে যেতে পারে। আর যারা জড়িত নেই তারা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করুক যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইজ্জতের সাথে রিযিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, ঐসব জটিলতায় আমাদেরকে জড়িত করেননি। আর যারা জড়িয়ে গেছে তারা আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করতে থাকুক এবং তাওফীক চাইতে থাকুক যেন তাদের বিচ্যুতি না ঘটে। তাদের জন্য পরামর্শ হল, যদি তারা হযরত পালনপুরী দা.বা. এর মশওয়ারা অনুযায়ী দীর্ঘদিন দীনী খিদমত করে তারপর গিয়ে ব্যবসায় জড়িত হয়ে থাকেন তাহলে তো ঠিক আছে। আর যদি এমনটি না হয় বরং প্রথম থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে গেছেন এবং কোন দীনী খিদমতের সঙ্গেও জড়িত নেই তাহলে তারা যেন দ্রুত ইলমে দীনের খিদমতে সম্পৃক্ত হয়ে যান। উর্দূ পেহলী হোক, উর্দূ দোসরী হোক, কুরআন পাকের তরজমা হোক, কিংবা হাফেয হলে হিফয শোনার ব্যবস্থা হোক, নাযেরা খানায় সম্ভব হলে নাযেরাতেই হোক তারা দীনের খিদমতে জাড়িত হয়ে যাক। অর্থাৎ সে যেন দিনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় সবকিছু থেকে এক-সূ হয়ে 'মোবাইল বন্ধ করে' ইলমে দীনের খিদমতের জন্য নিজেকে ফারেগ করে নেয়। অন্যথায় তার ব্যাপারে আমাদের খুব আশঙ্কা আছে, সে এই দীনী পরিবেশের সঙ্গে কিছুদিন পর আর হয়তো সম্পৃক্ত থাকতে পারবে না।

কাজেই কেউ যদি ঐ লাইনে চলে গিয়েই থাকে, তাহলে তার জন্য ইলমে দীনের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরী। এই সম্পর্ক ছাড়া সামনে সে টিকতে পারবে না। সাথে সাথে বিলাসিতাও পরহেয করতে হবে, চাই সে যত বড় ব্যবসায়ী আর পুঁজিপতিই হয়ে যাক না কেন। কারণ বিলাসিতা এটা কখনো আমাদেরকে ইলমে দীনের খিদমত করতে দেয় না। কেননা একজন মুদাররিস আর ক'টাকাই বা বেতন পাবে! এই টাকা দিয়ে সে তো এই যুগে একটা মোবাইলও পালতে পারবে না। যদি ইন্টারনেট কানেকশন থাকে আর কয়েকটা সিম ব্যবহার করে তাহলে হিফয খানা বা কিতাব খানার উস্তাদ হয়ে সে যে ওযীফা পাবে তা দিয়ে মোবাইলও চালাতে পারবে না। উপরন্তু বেতনও নিয়মিত পাবে না। এজন্য শুরু থেকেই বিলাসিতার পথ পরিহার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী, যারা কওমী মাদরাসার দারুল ইকামায় থেকে পড়ালেখা করে তারা ঐ মিসকিনী অনুভূতি নিয়েই গড়ে উঠেছে। যে কোনভাবেই হোক তারা ডাল-ভাত খেয়েই এ পর্যন্ত পৌঁছেছে। গুরবত আর মিসকিনীর একটা ট্রেনিং তাদের হয়ে গেছে। তারা যেন এই নেয়ামত হাতছাড়া না করে। আসাতিযায়ে কেরাম যে ছাত্রদেরকে খানা-পিনার ক্ষেত্রে পোশাকাদির ক্ষেত্রে বিলাসিতা পরহেয করতে বলেন, এর কারণ হল, যে ব্যক্তি খাওয়া-দাওয়া আর পোশাক আশাকের বিলাসিতায় পড়ে যাবে কিছুদিন পর সে আর মাদরাসায় তাদরীসে থাকতে পারবে না। কারণ সে দেখবে, আমি এতদিন যেভাবে খরচ করে এসেছি শিক্ষকতা করে তো আমার হাতখরচই উঠবে না। কাজেই শিক্ষকতা সে করতেই পারবে না, করলেও পাশাপাশি ভিন্ন ফিকির করবে। সুতরাং বিশেষ করে নবীন ফাযেলদেরকে বলছি, এখন থেকেই বিলাসিতার পথ পরিহার করবে। জরুরী প্রয়োজন অল্পের মধ্যেই সারার চেষ্টা করবে। তাহলে কর্মজীবনে বেতন না পেলেও চলবে, অল্প পেলেও চলবে। বেতন আমাদের মূল উদ্দেশ্য হবে না, উদ্দেশ্য হবে দীনের খিদমত। সুতরাং কারও যদি দীনের খিদমতের ইন্তেযাম হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলা কারও দ্বারা তার দীনের খিদমত নেন তাহলে সে জমে বসে সেই খিদমত আঞ্জাম দিবে। এভাবে দশ বছর খিদমত করে দেখো, আল্লাহ তা'আলা তারপর তোমার জন্য বিলাসিতার এত এত সামানের ব্যবস্থা করে দিবেন যে, উপভোগ করে শেষ করতে পারবে না।

হযরত উমরে ফারূক রাযি. কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে নসীহতমূলক যে কথাটি বলেছিলেন সে কথা দিয়েই আমি আমার আলোচনা শেষ করতে চাচ্ছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তার পবিত্র সহধর্মীনীগণের সঙ্গে এক মাসের ঈলা করে দোতলায় উঠে গিয়েছিলেন। হযরত উমরে ফারূক রাযি. অনুমতি নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখলেন, নবীজী যে রশির খাটিয়াটির ওপর শোয়া ছিলেন, তার পবিত্র শরীরে তার রশির দাগ পড়ে গেছে। দেখে হযরত উমর রাযি. খুব কাঁদলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দু'আ করে দিন, আল্লাহ তা'আলা যেন মুসলমানদেরকে মালী প্রশস্ততা দান করেন। আজ কায়সার কিসরা আল্লাহর দুশমন হয়েও কত আয়েশী জীবন যাপন করছে আপনি দোজাহানের বাদশাহ হয়েও আপনার শরীরে চাটাইয়ের রশির দাগ! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে খাত্তাবের বেটা! ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى তুমি কি এতে খুশি নও যে, আমাদের জন্য হবে আখেরাত আর ওদের জন্য স্রেফ দুনিয়া? (সুনানে বাইহাকী; হা.নং ১৩০৮৪)

হে আবনায়ে রাহমানিয়া! তোমরাও কি এতে রাজি-খুশি নও যে, আমাদের জন্য হবে আখেরাত আর অন্যদের জন্য দুনিয়া? (সকলে সমস্বরে– অবশ্যই! অবশ্যই!! আমরা রাজি আছি, আমরা খুশি আছি।) আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

অনুলিখন : মাওলানা আবূ সাইম

রমাযান ১৪৩৮ হিজরী সনের যাকাত ও ফিতরার নেসাব এবং ফিতরার সম্ভাব্য বাজারমূল্য

যাকাতের নেসাব

(ক) শুধু স্বর্ণ হলে কমপক্ষে ৭.৫ তোলা/ভরি = ৮৭.৫ গ্রাম। **(খ)** শুধু রূপা হলে কমপক্ষে ৫২.৫ তোলা/ভরি = ৬১২ গ্রাম। **(গ)** শুধু নগদ অর্থ বা ব্যবসায়িক পণ্য হলে কমপক্ষে ৫২.৫ তোলা/ভরি রূপার মূল্যের সমপরিমাণ। **(ঘ)** স্বর্ণ, রূপা, নগদ টাকা ও ব্যবসায়িক পণ্য থেকে যে কোন একাধিক প্রকার থাকলে মূল্য হিসেবে কমপক্ষে ৫২.৫ তোলা/ভরি রূপার মূল্যের সমপরিমাণ।

বর্তমান বাজারমূল্য

(ক) প্রতি ভরি রূপার বর্তমান বাজার দর ৭৫০ টাকা। অতএব ৫২.৫ ভরি রূপার মূল্য ৫২.৫×৭৫০=৩৯৩৭৫ টাকা বা ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা প্রায়। **সুতরাং টাকার হিসেবে বর্তমান যাকাত ও ফেতরার সর্বনিম্ন নেসাব ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা।** কাজেই যার মালিকানায় যত ভরি যাকাতযোগ্য রূপা আছে সেটাকে ৭৫০ দ্বারা গুণ করে তার ২.৫ শতাংশ হারে যাকাত প্রদান করবে। **(খ)** মালিকানাধীন স্বর্ণের বর্তমান বাজার দর প্রতি তোলা/ ভরি গড়ে ৩৮,০০০ (আটত্রিশ হাজার) টাকা। কাজেই যার মালিকানায় যত ভরি যাকাতযোগ্য স্বর্ণ আছে সেটাকে ৩৮,০০০ দ্বারা গুণ করে ২.৫ শতাংশ হারে যাকাত প্রদান করবে।

ফিতরা কী দ্বারা আদায় করবে, কীভাবে আদায় করবে?

আদায়কারীর আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গম, আটা, যব, খেজুর, কিশমিশ, পনির এ ছয়টি খাদ্যবস্তুর যে কোন একটি দ্বারা বা তার বাজার মূল্য দ্বারা ফিতরা আদায় করা যায়।

(ক) গম ও আটার ফিতরার পরিমাণ আধা সা' = ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম প্রায়। সম্ভাব্য বাজারমূল্য ৩০×১.৬৫ = ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা।
(খ) যবের ফিতরার পরিমাণ এক সা' = ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম প্রায়। সম্ভাব্য বাজারমূল্য প্রায় ৩০×৩.৩০ = ১০০ (একশত) টাকা।
(গ) খেজুরের ফিতরার পরিমাণ এক সা' = ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম প্রায়। সম্ভাব্য বাজারমূল্য (মাঝারি মানের খেজুরের মূল্য হিসেবে) প্রায় ৩০০×৩.৩৩ = ১,০০০ (একহাজার) টাকা। **(ঘ)** কিশমিশের ফিতরার পরিমাণ এক সা' = ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম প্রায়। সম্ভাব্য বাজারমূল্য (মাঝারি মানের কিশমিশের মূল্য হিসেবে) প্রায় ৩৬০×৩.৩৩ = ১২০০ (একহাজার দুইশত) টাকা। **(ঙ)** পনিরের ফিতরার পরিমাণ এক সা' = ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম প্রায়। সম্ভাব্য বাজারমূল্য ৫০০×৩.৩০ = ১৬৫০ (একহাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা।

স·ম·সা·ম·য়ি·ক প্রসঙ্গ

মাহে রমাযান : তাকওয়া ও আমলের মাস

মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

রমাযানুল মুবারক পুরোটাই রহমত বরকত আর মাগফিরাতের মাস। এই মাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। রমাযানের ৩ তারিখে হযরত ফাতেমা রাযি. ইন্তেকাল করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসেম ১০ই রমাযান সিন্ধু বিজয় করেছেন এবং তার বরকতে দক্ষিণ এশিয়ার এই অঞ্চলে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। রাজা দাহিরের হিন্দু বাহিনীকে পরাজিত করে তিনি মুলতান পর্যন্ত পৌঁছে যান। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১১ই রমাযানুল মুবারক মক্কা বিজয়ের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হন এবং ২০শে রমাযান মক্কা বিজয় করেন। ১১ই রমাযান হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাযি. ইন্তেকাল করেন। ১৫ই রমাযান শহীদে কারবালা হযরত হুসাইন রাযি. জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ই রমাযান হক এবং বাতিলের প্রথম লড়াই বদরের ঐতিহাসিক জিহাদ সংঘটিত হয়। যাতে ৩১৩জন মুসলমানের প্রায়নিরস্ত্র বাহিনী ১০০০ সুসজ্জিত কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। ২১শে রমাযান খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী রাযি.কে শহীদ করা হয়। যার মূলে ছিল খারেজীদের ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র। তবে এসব ঘটনা একই রমাযানে সংঘটিত হয়নি বরং বিভিন্ন বছরের রমাযানে সংঘটিত হয়েছে।

এ মাসের বিশেষ বিশেষ ইবাদাতের মধ্যে রয়েছে অধিক পরিমাণে কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত। প্রতি রমাযানে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনে কারীম শোনাতেন। নবীজীও তাকে শোনাতেন। অনুরূপভাবে হযরত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ সকল আল্লাহওয়ালার মামুল ছিল এই মাসে অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করা। কেননা এ মাসেই কুরআনে পাক নাযিল হয়েছে এবং এ মাসেই রয়েছে মহিমান্বিত লাইলাতুল কদর। যে রাতে ইবাদাত করা হাজার মাস ইবাদাত-বন্দেগী করার চেয়ে উত্তম। এ রাতের কল্যাণ থেকে যে বঞ্চিত হয়ে গেল সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল।

এ মাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হল ইতিকাফ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও অত্যন্ত পাবন্দির সাথে এ মাসে ইতিকাফ করেছেন এবং উম্মতকেও উৎসাহ প্রদান করেছেন।

রমাযানের শেষে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। যার বরকতে রোযার ভুল-ক্রটি মাফ করে রোযা কবুল করে নেয়া হয়। সর্বশেষ ঈদের রাতের ফযীলত বর্ণনাতীত। এ রাতকে পুরস্কারের রাত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ঈদের নামায শেষে রোযাদারগণ এমন নিষ্পাপ অবস্থায় ঘরে ফিরে আসে যেন তাদের মা আজই তাদেরকে প্রসব করেছে। মোটকথা এ মাস অত্যন্ত বরকতময় এবং মহিমান্বিত। ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন রোযা পুরা করার জন্য এ মাসকে নির্ধারণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে মুসলমানরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য অর্জন করতে পারে। এ মাসকে যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার পবিত্র গ্রন্থ অবতীর্ণ করার জন্য বাছাই করেছেন তাই এর দ্বারাও এ মাসের গুরুত্ব সহজে উপলব্ধি করা যায়।

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন রমাযান মাস আগমন করে তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। দুর্বৃত্ত শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। অন্য বর্ণনায় আছে, রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৮৯৮, ১৮৯৯, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০৭৯)

আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়ার অর্থ হল, এ পবিত্র মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার রহমত একের পর এক বর্ষিত হতে থাকে। বান্দাদের নেক আমল কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া কবুল হতে থাকে। কবুলিয়্যতের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। বান্দা যা কিছু প্রার্থনা করে মঞ্জুর হতে থাকে। জান্নাতের দরজা খুলে যাওয়ার এক অর্থ হল, বান্দা ঐ সমস্ত নেক আমলের তাওফীক লাভ করে যা জান্নাতে যাওয়ার কারণ হয়। দোযখের দরজা বন্ধ করে দেয়ার এক মর্ম হল, রোযাদার ব্যক্তি সাধারণত এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকে যা দোযখে যাওয়ার কারণ হয়। রমাযান মাসে বান্দা যখন কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচতে সচেষ্ট হয় তখন রোযার বরকতে তার সগীরা গুনাহগুলো মাফ হতে থাকে।

দুর্বৃত্ত শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। তার থেকে গোনাহে লিপ্ত করার শক্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়। ফলে সে বান্দাকে ধোঁকা দেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। রোযার কারণে বান্দার পশুপ্রবৃত্তি দমন হতে থাকে যা সমস্ত ক্রোধ এবং খাহেশাতের মূল এবং বিভিন্ন গোনাহের উৎস। পক্ষান্তরে আনুগত্য ও ইবাদাতের শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে বান্দা নেক কাজের প্রতি ধাবিত হয়। এজন্যই দেখা যায় অন্যান্য মাসের তুলনায় রমাযানে গুনাহ অনেক কম হয়ে থাকে।

রমাযান মাসেই রোযার বিধান দেয়ার কারণ

মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. আরকানে আরবাআ নামক গ্রন্থে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা রমাযানে রোযাকে ফরয করেছেন এবং একটিকে অপরটির সঙ্গে আবশ্যিক করে দিয়েছেন। এর সবচেয়ে বড় কারণ হল, রমাযান সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে এবং হারিয়ে যাওয়া মানবতা সুবহে সাদিকের সন্ধান পেয়েছে। এজন্য এটা যুক্তিযুক্ত ছিল যে, সূর্যোদয়কে যেমন রোযা শুরু করার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে অনুরূপভাবে এ মাসকেও যে মাসে দীর্ঘ অন্ধকারের পরে মানবতার সূর্য উদিত হয়েছিল রোযার জন্য খাস করে দেয়া হোক। কেননা আদিকাল থেকেও এ মাস অন্যান্য মাসের তুলনায় আল্লাহ পাকের রহমত, বরকত আর আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর ছিল। সুতরাং বান্দার আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য এই মাসই ছিল যথোপযুক্ত যে, এ মাসের দিনগুলোতে রোযা রাখা হবে, আর রাতগুলোতে ইবাদাত-বন্দেগী করা হবে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. তার এক মাকতুবাতে লিখেছেন, কুরআনে পাকের সঙ্গে এ মাসের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। সেই বিশেষ সম্পর্কের কারণে এ মাসে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে।

এই মাস সব রকমের কল্যাণ ও মঙ্গলের ধারক। বান্দা সারা বছর সমষ্টিগতভাবে যে পরিমাণ বরকত ও কল্যাণ লাভ করে এই মাসের সামনে তার দৃষ্টান্ত এমন যেমন এক ফোঁটা পানির তুলনায়

মহাসমুদ্র। এই মাসে আধ্যাত্মিকতা ও রূহানিয়াতের যে উৎকর্ষ সাধিত হয় তা সারা বছরের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। ঐ সমস্ত লোক সৌভাগ্যের অধিকারী ও মুবারকবাদ পাওয়ার উপযুক্ত যাদের উপর এই মাস সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় নিয়ে গেছে। আর হতভাগা ও বঞ্চিত ঐ সকল লোক যাদের উপর নারাজ হয়ে এই মাস বিদায় নিয়ে গেছে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. অন্য আরেকটি মাকতুবাতে বলেন, কোন ব্যক্তি যদি এই মাসে নেক আমলের তওফীক লাভ করে তাহলে পুরা বছর এই তাওফীক তার শামেলে হাল হবে। পক্ষান্তরে এই মাসে যদি অলসতা, গাফলতি আর বে-ফিকরীর সাথে অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে সারা বছর তার এভাবেই কেটে যাবে।

রমাযান ইবাদাতের বিশ্বজনীন মৌসুম

ইবাদাত, যিকির-আযকার, তেলাওয়াত, যুহদ ও তাকওয়া রমাযান মাসকে এমন এক বিশ্বজনীন মৌসুম ও উৎসবে পরিণত করেছে যে, এই মাসে পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ সমস্ত মুসলমান আলেম-জাহেল, ফকীর-ধনী, শাসক-শাসিত, চাকুরীজীবি-ব্যবসায়ী মোটকথা সমস্ত শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে এমন এক উঁচু হিম্মত, সহমর্মিতা, সমবেদনা, আত্মত্যাগ আর কুরবানীর এমনই জ্বলন্ত নমুনা পয়দা করে দিয়েছে যার নজীর বিশ্বের অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই রমাযান একই সময়ে সব শহরে আর সব গ্রামে তার শান-শওকতসহ উদ্ভাসিত হয়। ধনী আর গরীবের ঘরে একই উৎসাহ-উদ্দীপনায় পালিত হয়। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, এ কারণে না তো কারো মধ্যে আত্মঅহংকার আর বড়াইভাব পরিলক্ষিত হয়, আর না বিক্ষিপ্ততার সম্মুখীন হতে হয়। যাকে আল্লাহ তা'আলা বিবেক-বুদ্ধি আর অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন সে পৃথিবীর কোনায় কোনায় এই মহাসত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। অবস্থাদৃষ্টে এমন মনে হয় যে, সারা মুসলিম জাহানে একটি নূরানী পরিবেশ আর শান্তি রহমতের মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।

রমাযান মাসে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আমীনকে নির্দেশ দেন যে, যমীনে অবতরণ করে শয়তান আর তার চেলাপেলাকে বন্দী কর। যাতে তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের রোযাকে নষ্ট করতে না পারে। (শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী; হা.নং ৩৬৯৫)

রমাযান মাস আসলে হযরত উমর রাযি. স্বগতোক্তি করে বলতেন, বাহ! কত মুবারক মাস যা আমাদেরকে পাক-পবিত্র করার জন্য আগমন করেছে। পুরা রমাযানই তো খায়র বরকতের মাস, চাই দিনের রোযা হোক কিংবা রাতের কিয়াম হোক। এই মাসে খরচ করা জিহাদে খরচ করার সমতুল্য। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

রোযার ফযীলত

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, বনী আদমের সব আমল কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয় আর নেকী দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম। কেননা এটা শুধুমাত্র আমারই জন্য, সুতরাং স্বয়ং আমিই তার বিনিময় প্রদান করব। রোযাদার ব্যক্তি আমার সন্তুষ্টির জন্যই তার খানা-পিনা আর খাহেশাতকে পরিত্যাগ করেছে সুতরাং তার জন্য দুটি খুশি। একটি ইফতারের সময় অপরটি স্বীয় রবের সঙ্গে মুলাকাতের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ পাকের নিকট মেশকের চেয়ে সুঘ্রাণযুক্ত। (সুনানে নাসায়ী; হা.নং ২২১৪)

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে একটি দরজা আছে যার নাম রাইয়ান। শুধুমাত্র রোযাদাররাই উক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে সেখানে প্রবেশ করবে তার কখনো পিপাসা অনুভূত হবে না। (সুনানে নাসায়ী; হা.নং ২২৩৬)

এই পবিত্র মাসে মুসলমানদের তারবিয়াত করা হয় যেন তার সবর করা শেখে, সহমর্মিতা আর সমবেদনা প্রকাশ করা শেখে, নিজেদের পেট আর যবানের হেফাযত করা শেখে। উপরন্তু নিজেদেরকে গুনাহ থেকে বিরত রাখতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

রোযার আদব

রোযার মাসে এত বেশি খাবে না যে, সারাদিন ঢেকুর উঠতে থাকে আর প্রবৃত্তি দমিত না হয়ে আরো চাঙ্গা হতে থাকে। কেননা রমাযানে যদি ভাল ভাল মজাদার খানা খাওয়া হয় তাহলে পশুপ্রবৃত্তি আরো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে রোযার যে উদ্দেশ্য ইসলাহে নফস তা অর্জিত না হয়ে রোযার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে যায়।

নিজের চোখ, কান আর যবানের হেফাযত করা জরুরী। যবান দ্বারা গালি-গালাজ, মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী না হয়। কান দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কিছু শ্রবণ না করা হয়। আর কুদৃষ্টি থেকে সতর্কতার সঙ্গে বেঁচে থাকা হয়। রোযার বাইরে যে সব জিনিস হালাল ছিল রোযার মধ্যে সেগুলো যখন হারাম করে দেয়া হল তখন রোযার বাইরে যেগুলো হারাম ছিল রোযার মধ্যে সেগুলো তো আরো কঠিনভাবে হারাম হয়ে যায়। সুতরাং একজন রোযাদারকে বারবার একথা চিন্তা করতে হবে যে, যেটা আমার জন্য হালাল ছিল সেটা তো আমি পরিত্যাগ করলাম, তাহলে যেটা আমার জন্য হারাম ছিল সেটা আমি কেন করতে যাব?

ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে নিজের বানিয়ে নেন তাকে দুনিয়ার ঝক্কি-ঝামেলা থেকে দূরে রাখেন তখনই সে প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়। ফলে তার সমস্ত কাজকর্ম আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী সম্পাদিত হতে থাকে। তখন তার দুনিয়াও দীন হয়ে যায়।

রমাযান মাসে তাহাজ্জুদ পড়াও সহজ হয়ে যায়। কেননা সাহরীর জন্য রোযাদারকে তো উঠতেই হয়। একটু আগে আগে উঠলে সহজেই দু'চার রাকাআত পড়া যায়। আল্লাহওয়ালারা তো সার বছরই তাহাজ্জুদ পড়ে থাকেন। তাদের প্রতিটি রাতই শবে কদরে পরিণত হয়। আর আমরা কমপক্ষে রমাযানের রাতগুলোকে শবে কদরে পরিণত করার চেষ্টা করি।

রোযার উদ্দেশ্য

খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি আর তাকওয়া অর্জন করাই হচ্ছে রোযার মূল উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য জরুরী হচ্ছে লোকদের সঙ্গে মেলামেশা কমিয়ে দেবে। চোখ, কান, মুখ, হাত, পা-সহ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে গুনাহ থেকে হেফাযত করবে। অনেক লোক এমন আছে যারা রোযার দিনে সময় কাটানোর জন্য দাবা, তাস, লুডু, ক্যারামবোর্ড ইত্যাদি হারাম খেলায় লিপ্ত থাকে। আর এখন তো মোবাইলে গেমস, ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে রমাযানের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোকে নষ্ট করতে থাকে। অথচ সময় পার করার জন্য সবচেয়ে উত্তম উপায় হল, কুরআনে পাকের তেলাওয়াত করতে থাকা। কমপক্ষে ঘুমিয়ে থাকলেও তো মানুষ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে!

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তার মর্জিমত রমাযান মাস অতিবাহিত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক : মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
খতীব, বাইতুস সুজুদ জামে মসজিদ, মুহাম্মাদপুর

সমসাময়িক প্রসঙ্গ

একটি বিভ্রান্তি ও তার নিরসন

সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা, ঈদ ও কুরবানী পালন

মুফতী আনওয়ারুল হক

ইসলামের শুরুলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় দেড় হাজার বছর বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোযা, ঈদ ও কুরবানী পালিত হয়ে আসছে। কোন ফকীহ বা ইমাম গোটা বিশ্বে একই দিনে রোযা, ঈদ ও কুরবানী পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি এবং এর প্রয়োজনও অনুভব করেননি।

কিন্তু ইদানিং মুষ্টিমেয় কিছু বন্ধু সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা, ঈদ ও কুরবানী পালন করার বক্তব্য প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। তারা এটাকে শরীয়তের ফরয ও উম্মাহর একতার অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে গণ্য করে থাকেন। এক্ষেত্রে তারা প্রধানত দু'টি দলীল পেশ করে থাকেন-

(ক) অন্যান্য ধর্মের লোকেরা সারা বিশ্বে নিজেদের উৎসব একই দিনে উদযাপন করে থাকে। কাজেই আমাদেরও কর্তব্য সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ পালন করা।

(খ) নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোযা, ঈদ ও কুরবানী আদায় করা ইখতিলাফ বা বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার নামান্তর। তাই এই ইখতিলাফ দূর করার জন্য একই দিনে রোযা, ঈদ, কুরবানী করা প্রয়োজন।

প্রথমোক্ত দাবী প্রমাণ করে, এসব ব্যক্তিবর্গ দীনের রুচি-প্রকৃতি গ্রহণ করেননি এবং দীনী পরিবেশ থেকে দূরে থাকার কারণে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী বিধানে তাদের সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তি অনেক কম। যে কারণে তারা নিজেদের মূল্য-মর্যাদা অন্যান্য জাতির সাদৃশ্য গ্রহণের মধ্যেই নিহিত মনে করেন। একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, আমাদের ঈদ আর অন্যান্য জাতির উৎসব এক নয়; এর মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। কারণ অন্যান্য জাতির উৎসব হল নিছক মনগড়া সংস্কৃতি– যার মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা ও বাহ্যিক সাজ-সজ্জাই মূল। পক্ষান্তরে ঈদ একটি ইবাদত ও খালেস দীনী উৎসব যা ইসলামী সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। উপরন্তু মুসলমানদেরকে এই দুই ঈদের বিধান দেয়াই হয়েছে আচার-অনুষ্ঠান পালনে অন্যদের থেকে তাদেরকে আলাদা রাখার জন্য। হাদীসে এসেছে,

عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما فى الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر.

অর্থ : হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন, মদীনাবাসীরা বাৎসরিক দু'টি দিনে উৎসব পালন করে। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'টি দিনের তাৎপর্য কী? তারা বলল, জাহেলী যুগে আমরা এ দু'টি দিনে আনন্দ-ফুর্তি করতাম। (সে হিসেবে এখনও করছি।) একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ দু'টি দিনের পরিবর্তে আরও উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন। তা হল, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১১৩৪, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১২০০৬)

এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হল, আমাদের ঈদ অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির মত নিজেদের বা পূর্বপুরুষদের উদ্ভাবিত ও আবিষ্কৃত কোন সংস্কৃতি নয়; বরং তা সম্পূর্ণ সুন্নাতে নববী এবং সরাসরি ইবাদত। কাজেই একই দিনে ঈদ উদযাপনের বিষয়টিকেও অন্যান্য ইবাদতের মত শরীয়তের সূত্র ও দলীলের নিক্তিতে মেপে দেখতে হবে। দেখতে হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায় ও পূর্বসূরীদের কর্মপন্থায় এ ব্যাপারে কী দিকনির্দেশনা বিদ্যমান। অতঃপর উক্ত দিকনির্দেশনার আলোকে ঈদ পালনের যে পদ্ধতি নির্ধারিত হবে সেটাই তার প্রকৃত পদ্ধতি বলে গণ্য হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে অন্যান্য জাতি কী করল, না করল তা দেখা বিলকুল গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় দলীলটি দলীলদাতা বন্ধুদের দীনী বিষয়ে প্রজ্ঞাহীনতার পরিচয় বহন করে। কারণ তারা 'ইখতিলাফ' ও 'ইফতিরাক'কে এক করে ফেলেছেন। অথচ এ দুটোর মর্ম ভিন্ন। ইখতিলাফ মানে হল বিভিন্নতা, আর ইফতিরাক মানে বিভেদ। ইফতিরাক তথা বিভেদ সম্পূর্ণ নিন্দিত যা পরিহার করা ফরয। কিন্তু শরীয়ত অনুমোদিত 'ইখতিলাফ' বা বিভিন্নতা বিলুপ্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ শরীয়ত অনুমোদিত ইখতিলাফ তো বিভেদের কারণই নয়। তা সত্ত্বেও যদি ইখতিলাফের কারণে কোন বিভেদ দৃষ্টিগোচর হয় তার কারণ মূলত ইখতিলাফকে হজম করতে পারার যোগ্যতা না থাকা। এর চিকিৎসা তো শরীয়তসম্মত ইখতিলাফকে নির্মূল করার মধ্যে নয়; বরং শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় ইখতিলাফের সঠিক চর্চা ও অনুশীলনের মধ্যে নিহিত।

এক্ষেত্রে শরীয়ত নির্দেশিত পন্থা হল, যে সকল মাসআলায় ইমামগণের ইখতিলাফ রয়েছে তাতে সাধারণ মানুষ আলেমদের শরণাপন্ন হবে। অতঃপর আলেমগণ যে সিদ্ধান্ত দিবেন সে অনুযায়ী আমল করবে। এ অবস্থায় এদের প্রতি ভিন্নমতের ওপর আমলকারীদের সমালোচনা করার কোন অধিকার থাকবে না।

যদি প্রত্যেক দলের আলেমগণ মানুষকে উপরোক্ত শরঈ পন্থা অনুসরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং দীনের সমঝদার প্রতিটি মানুষ এ পন্থা অনুসরণ করেন তাহলে কোন মতভেদপূর্ণ মাসআলায় ইনশাআল্লাহ বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না।

মোটকথা, ইফতিরাক বা বিভেদ-বিশৃঙ্খলা নিঃসন্দেহে নিন্দিত ও পরিহারযোগ্য। কিন্তু শরীয়তসম্মত ইখতিলাফ বিভেদ-বিশৃঙ্খলা নয় এবং পরিহার যোগ্যও নয়। তবে যারা শরীয়তসম্মত ইখতিলাফের ক্ষেত্রগুলোতে শরীয়তসম্মত কর্মপন্থা অনুসরণ করে না, তারা শরীয়তসম্মত ইখতিলাফকেও বিভেদের কারণ বানিয়ে ফেলে। এরূপ লোকদের অবশ্য কর্তব্য হল, নিজ কর্মপন্থা সংশোধন করে নেয়া।

এ ধরনের লোকেরা যদি নিজ নিজ কর্মপন্থা সংশোধনের পরিবর্তে প্রত্যেক মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোকে 'মুজমা আলাইহি' তথা সর্বসম্মত বিষয়ের মর্যাদা দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয় তাহলে একে তো সেটা বৈধই হবে না, দ্বিতীয়ত এটা

হবে এক ব্যর্থ চেষ্টা। উদাহরণত যুগ যুগ ধরে চলে আসা মাযহাবের ভিন্নতাকে দূর করে যারা সকল মাযহাবকে এক করার চেষ্টা করেছেন তারা কেবল নতুন নতুন অযৌক্তিক মাযহাবই সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ নামায আদায়ের পদ্ধতিগত ভিন্নতা উঠিয়ে দেয়াকে যারা ভালো কাজ মনে করেন তারা কেবল সমাজে অস্থিরতাই বৃদ্ধি করেন, মসজিদের মত পবিত্র স্থানে বিভেদ-বিশৃঙ্খলার বীজ বপন করেন। তাই আমরা নির্দ্বিধায় একথা বলতে পারি, রমাযান, ঈদ ও কুরবানীর তারিখের ইখতিলাফের কারণে কথিত যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় (যদিও কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী ছাড়া বাস্তবে কারো মধ্যে কোন অস্থিরতা নেই, বিশৃঙ্খলাও নেই) তার জন্য মূলত ইখতিলাফ দায়ী নয়; বরং ইখতিলাফী বিষয়ে শরীয়তসম্মত আদব ও আচরণবিধি অনুসরণ না করাই এর জন্য দায়ী।

আর আলোচ্য বিষয়টিও একটি ইখতিলাফী বিষয়। এক্ষেত্রে চার মাযহাবের প্রত্যেকটির ফকীহগণের মাঝেও এ বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। প্রত্যেক মাযহাবেই উভয় মতের ফকীহ রয়েছেন।[১] এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানতে 'মাসিক আলকাউসার' অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ২০১৩ ও জানুয়ারি ২০১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

তাদের অভিমতের মূল উৎস

জুমু'আর নামায বা ওয়াক্তিয়া নামায সারা বিশ্বে যেমন একই সময়ে আদায় করা হচ্ছে না; বরং বিভিন্ন সময়ে আদায় করা হচ্ছে এবং একই সময়ে আদায় করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা শরীয়তে নেই এবং এটা বাস্তবে সম্ভবও নয়, তেমনিভাবে রোযা, ঈদ এবং কুরবানীও একই সময়ে হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতাও শরীয়তে নেই এবং এটাও সম্ভব নয়। কারণ এগুলো এমন ইবাদত যা নির্দিষ্ট ওয়াক্তে আদায় করতে হয়। আর কোন নির্দিষ্ট ওয়াক্ত সারা বিশ্বে একই সঙ্গে পাওয়া সম্ভব নয়। এ মর্মে কোন আয়াত বা সহীহ হাদীস কিংবা ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা তারা পেশ করতে পারবে না। এক্ষেত্রে তাদের একমাত্র পুঁজি মুতাকাদ্দিমীন ফুকাহায়ে কেরামের দু'টি উক্তির অপব্যাখ্যা। উক্তি দু'টি এই-

لا عبرة لاختلاف المطالع.

অর্থ : উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়। (আলবাহরুর রায়িক ২/২৭০)

لو رأى اهل المغرب هلال رمضان يجب الصوم على اهل المشرق.

অর্থ : পশ্চিমপ্রান্তে রমাযানের চাঁদ দেখা গেলে পূর্বপ্রান্তের লোকদের উপরও রোযা ফরয হয়ে যাবে। (আলবাহরুর রায়িক ২/২৭০)

বিভিন্ন 'মুতাকাদ্দিম ফিকহে'র কিতাবে এ ধরনের ইবারত (পাঠ্য) থাকায় উক্ত বন্ধুগণ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন এবং সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ, রোযা ও কুরবানী করা ফরয এ মতবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

বস্তুতঃ উপরোক্ত উক্তিদ্বয় ফুকাহায়ে কেরামের কুরআন-হাদীস নিঃসৃত গবেষণা। সুতরাং উক্ত উক্তির এমন ব্যাখ্যা দিতে হবে যা আয়াত, হাদীস, সাহাবাদের আমল ও বাস্তবতার সাথে মিলে যায়। এমন কোন ব্যাখ্যা করা যাবে না, যে ব্যাখ্যা অনুযায়ী উক্তি দু'টি কুরআন ও হাদীসের বাস্তবতার বিরুদ্ধে চলে যায়। এদিকে লক্ষ্য রেখে উলামায়ে মুতাআখখিরীন উল্লিখিত উক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'কাছাকাছি শহরের ক্ষেত্রে চন্দ্রের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হবে না'। বরং এক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার চাঁদ প্রমাণের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

কাছাকাছি এলাকার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ঐসব এলাকা যেখানে চাঁদ দেখার সম্ভাব্যতায় সাধারণত এক/দুই দিনের পার্থক্য হয় না। শাসন ব্যবস্থাও এক। আর যেসব শহরের চাঁদ দেখার ব্যাপারটি এক/দুই দিনের পার্থক্য হয়ে থাকে সে সমস্ত এলাকাকে দূরবর্তী এলাকা বলা হয়। সেসব শহরের মধ্যে চন্দ্রের উদয়স্থলের পার্থক্য ধর্তব্য হবে। সেক্ষেত্রে এক শহরে বা এক দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে অন্য এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে না। (বাদায়িউস সানায়ি ২/৮৩)

তেমনিভাবে 'পশ্চিম এলাকার চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে পূর্ব এলাকার লোকদের জন্য রোযা ও ঈদ করা জরুরী হবে' এর অর্থ সম্পূর্ণ পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম এলাকা নয়। বরং একই শহরের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল উদ্দেশ। উক্ত কিতাবের আরবী পাঠ নিম্নরূপ-

قوله: ويلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب اذ ليس المواد باهل المشرق جميعهم بل بلدة واحدة تكفى كما لا يخفى.

(মিফতাহুল খালিক আলাল বাহরির রায়িক ২/৪৭২)

এ ধরনের একই কথা হানাফী মাযহাবের প্রচুর কিতাবে বিদ্যমান। যেমন- তাবয়ীনুল হাকায়িক (১/৩২১), মাজমাউল ফাতাওয়া (পৃষ্ঠা ২৫২), মারাকিল ফালাহ (পৃষ্ঠা ৫৩৩), ফাতাওয়া তাতারখানিয়া (২/৩৫৫-৩৫৬), হাশিয়াতুত তাহতাবী (পৃষ্ঠা ৩৫৫), ফাতহুল মুলহিম (৩/৩১৩) ইত্যাদি।

মারফূ' রিওয়ায়াত দ্বারাও উক্ত বিষয়টি প্রমাণিত। হযরত আনাস রাযি. এর পুত্র আবূ উমাইর বলেন, আমার নিকট আমার আনসারী চাচাগণ হাদীস বর্ণনা করেন,

قالوا أغمى علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد.

অর্থ : একবার মেঘের কারণে শাওয়ালের চাঁর দৃষ্টিগোচর হল না। ফলে পরদিন আমাদের সকাল হল রোযা অবস্থায়। দিনের শেষে এক কাফেলা এল এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাক্ষ্য দিল যে, তারা গত রাতে চাঁদ দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে আদেশ করলেন, এখন রোযা ভেঙ্গে ফেল এবং আগামীকাল ঈদের জন্য বের হও। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৯৫৫৪, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হা.নং ৭৩৩৯, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৬৫৯)

এ হাদীস থেকে সাধারণত এটাই বোঝা যায় যে, এ কাফেলা মদীনা থেকে অন্ততঃ এক দিনের দূরত্বে থাকাবস্থায় চাঁদ দেখেছেন। যদি রাতে সফররত থাকেন তাহলে অন্ততঃ দেড় দিনের দূরবর্তী স্থান থেকে মদীনায় পৌঁছেছেন। আর সে যুগে দিনে সাধারণত ১৬/১৭ মাইল সফর করার রীতি ছিল। অতএব বলা যায় তারা ২৫/২৬ মাইল দূরের এলাকায় চাঁদ দেখেছিলেন।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কাছাকাছি এলাকাসমূহে এক জায়গায় চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্য গ্রহণীয়।

---

১. স্মর্তব্য, ফকীহদের মাঝে মতভিন্নতা হল, 'তরীকে মুজীবের' মাধ্যমে চাঁদ দেখার সংবাদ কোন এলাকায় পৌছলে 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা' গ্রহণযেগ্য কিনা এ নিয়ে। 'সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করতে হবে' এমন কথা ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসে কেউ বলেনি। কোন ফকীহ থেকে কেউ একথা প্রমাণও করতে পারবে না; ইনশাআল্লাহ।

তবে যদি দুই অঞ্চলের মাঝের দূরত্ব এত বেশি হয় যে, উভয় জায়গার মাঝে সময়ের ব্যবধানও বেশি, যার ফলে সহজ-স্বাভাবিকভাবে এক জায়গার চাঁদ দেখা অনুযায়ী অন্য জায়গায় আমল করা সম্ভব হয় না। এ ধরনের ক্ষেত্রে একাধিক গবেষক আলেমের মতে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্য গ্রহণীয় না হওয়ার বিষয়টি ইজমায়ী ও সর্বসম্মত। কারণ সাহাবায়ে কেরামের শতবর্ষ যুগের এই রীতি অনুসৃত ছিল যে, আরেক এলাকার অধিবাসীগণ নিজ এলাকার চাঁদ দেখা অনুসরণ করতেন। কাছাকাছি জায়গা থেকে কোন নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য এসে গেলে তাও গ্রহণ করা হত। কিন্তু অন্য জায়গা থেকে সাক্ষ্য সংগ্রহ করা কিংবা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দারুল খিলাফায় যে ফয়সালা হয়েছে তা অন্য কোন অঞ্চলে পাঠানোর কোন আয়োজন করা হত না। সাহাবা যুগে এমন একটি ঘটনা ঘটে গেছে হাদীসের কিতাবে তা সংরক্ষিত হয়ে আছে। ঘটনা এই যে,

প্রখ্যাত তাবেয়ী কুরাইব ইবনে আবী মুসলিম কোন কাজে হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর নিকট শামে গিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে শামে রমাযানের চাঁদ দেখা গেল আর তা ছিল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত। কুরাইব মাসের শেষের দিকে মদীনায় পৌঁছলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কথা প্রসঙ্গে কুরাইবকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ? কুরাইব বললেন, জুমু'আ রাতে। ইবনে আব্বাস জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজে দেখেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি নিজে দেখেছি; অন্যরাও দেখেছে। সবাই রোযা রেখেছে। মু'আবিয়া রাযি.ও রোযা রেখেছেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন,

لكنا رأينا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى فكمل ثلاثين اونواه.

অর্থ : কিন্তু আমরা তো শনিবার রাতে (শুক্রবার দিবাগত রাতে) চাঁদ দেখেছি। অতএব আমরা আমাদের হিসাবমত ত্রিশ রোযা পূর্ণ করব। তবে যদি ঊনত্রিশ তারিখ চাঁদ দেখি সেটা ভিন্ন কথা।

কুরাইব জিজ্ঞাসা করলেন,

او لا تكتفى برؤيته معاوية وصيامه؟

অর্থ : আপনি কি মু'আবিয়া রাযি. এর চাঁদ দেখা ও রোযা রাখাকে যথেষ্ট মনে করেন না?

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন,

لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

অর্থ : না, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ আদেশই করেছেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০৮৭, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৭৮৯, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৩৩২, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৬৯৩, সুনানে নাসায়ী; হা.নং ২১১১)

উক্ত ঘটনায় হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. শামের ঘটনা তাহকীক করে মদীনাতেও একই দিনে রোযা রাখার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অথচ তিনি ইচ্ছা করলে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। আসলে তারা একই দিনে রোযা ও ঈদ করাকে জরুরী মনে করতেন না। তাই এ ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেননি।

উক্ত বন্ধুদের আরেকটি যুক্তি হল, হাদীসে এসেছে,

صوموا لرؤيته وافطروا برؤيته.

অর্থ : তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়ো।

এ হাদীসে সকল এলাকার জন্য ভিন্ন করে দেখার কথা বলা হয়নি। তাই হাদীসের মর্ম এই যে, যেখানেই চাঁদ দেখা যাক, তোমরা রোযা শুরু করো, দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখাও তোমাদের জন্য অবশ্য গ্রহণীয়।

এর উত্তরে বলব, উক্ত হাদীসে একসাথে সারা দুনিয়ার কথা বলা হয়নি। বরং প্রত্যেক এলাকার জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখার কথা বলা হয়েছে। হাদীসের এ অর্থই হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সহ অন্য সাহাবীরাও বুঝেছেন। আর ইবনে আব্বাস রাযি. একজন ফকীহ সাহাবী ছিলেন। তিনি নিজে ঐ হাদীস আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। তার মর্ম এটাই বুঝেছেন। ঐ সকল বন্ধুদের উদ্ভাবিত মর্ম বোঝেননি।

যেমন এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমরা পেশাব-পায়খানা করবে তখন পূর্বমুখী বা পশ্চিমমুখী হয়ে বসবে। এক্ষেত্রে উক্ত বন্ধুগণ কি বলবেন যে, এটা সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য বলা হয়েছে? নিশ্চয়ই না। কারণ সকল মুহাদ্দিস এ ব্যাপারে একমত যে, এটা মদীনাবাসী ও বাইতুল্লাহ থেকে উত্তরে ও দক্ষিণের এলাকাবাসীর জন্য প্রযোজ্য। পূর্ব-পশ্চিম অধিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

তাছাড়া তাদের ঐ ব্যাখ্যা বাস্তব বিরোধীও বটে। কারণ তাদের কথায় সারা পৃথিবীর জন্য চন্দ্রের উদয়স্থলের পার্থক্য ধর্তব্য নয়। এটা একটা চরম অবান্তর কথা। কারণ শত শত বছর ধরে পৃথিবীতে চন্দ্রের উদয়কে কেন্দ্র করে আরবী তারিখের পার্থক্য চলে আসছে। এ পার্থক্য তো চন্দ্রের উদয়স্থলের পার্থক্যের কারণেই হয়েছে। এ জ্বলন্ত বাস্তবতাকে অস্বীকার করা পাগলামীর বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়।

তারা আরো যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, আল্লাহ তা'আলা সারা বিশ্বের জন্য একটা সূর্য ও একটা চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক এলাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সূর্য-চাঁদ বানাননি। সুতরাং সারা বিশ্বে একই তারিখ হয়ে রোযা, ঈদ, কুরবানী এক দিনেই হবে।

এর উত্তরে আমরা বলব, চাঁদ-সূর্য একাধিক নয়, একথা ঠিক। কিন্তু এগুলোর উদয় অস্ত তো আর এক সময় হয় না। বরং কোথাও দেখা যায় পূর্ণিমার চাঁদ। ঠিক সেই মুহূর্তে কোথাও দ্বিপ্রহর বিদ্যমান। এখন যদি দূরবর্তী শহরে চাঁদ দেখা দেয়, নিশ্চয় সেখানে মাগরিবের সময় হবে। সুতরাং উক্ত দলের দাবী অনুযায়ী সেখানকার মাগরিবের সময়কেও গ্রহণ করে যোহরের সময় মাগরিব পড়া উচিত।

তেমনিভাবে পশ্চিমাঞ্চলের চাঁদ দেখা দূরবর্তী পূর্বাঞ্চলে গ্রহণ করলে পূর্বাঞ্চলের চাঁদ আটাশ দিনে শেষ হবে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী মাসের চাঁদ আকাশে একদিন বা দুইদিন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী মাস গণনা শুরু হয়ে যাবে। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, চান্দ্রমাস ২৯ কিংবা ৩০ দিনেই হয়ে থাকে। (সহীহ বুখারী ১/২৫৫)

অতএব সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর যামানা থেকে আজ পর্যন্ত রোযা, ঈদ ও কুরবানী যে নিয়মে চলে আসছে সেটাই শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

হজ্জের সফরনামা

হিজাযের মুসাফির

মুফতী সাঈদ আহমাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অসীম দয়াবান। নেককার গুনাহগার সকল বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া সীমাহীন। নেককারের নেকী বাড়াতে আর গুনাহগারকে ক্ষমা করতে তিনি শুধু বাহানা খোঁজেন। এমনিতেই তাঁর ক্ষমা ও দয়ার দুয়ার সর্বদা উন্মুক্ত; তদুপরি স্থান-কাল বিশেষে তাঁর দয়া ও ক্ষমায় শত-সহস্র মাত্রা যুক্ত হয়। যে নামায ঘরে পড়লে দশগুণ সওয়াব সে নামায জামে মসজিদে গিয়ে পড়লে পাঁচশত গুণ সওয়াব। মসজিদে নববীতে গিয়ে পড়লে হাজার গুণ আর মসজিদে হারামে পড়লে একলক্ষ গুণ। আর প্রতি গুণকে যদি গুণ করা হয় জামাআতে পড়ার সাতাশ গুণ দিয়ে তাহলে ফলাফল কী দাঁড়ায় তা আমরা ভেবেও দেখি না। কেউ কেউ কখনো ভাবলেও হয়ত বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করলে যে পরিমাণ উৎসাহ দেখানোর কথা তাতো পরিলক্ষিত হয় না। আসলে আমরা ক্ষুদ্র বলেই আমাদের চিন্তা-ভাবনাও ক্ষুদ্র। আর আল্লাহ তা'আলা অসীম তাই তাঁর দানও অসীম। তিনি ঘোষণা করেছেন,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অর্থ : নিশ্চয় ধৈর্যশীলদেরকে বে-হিসাব বিনিময় দান করা হবে। (সূরা যুমার-১০

নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে হারাম শরীফের ফযীলত যেমন শুধু মসজিদুল হারামে সীমাবদ্ধ নয় বরং পবিত্র হারামের পূর্ণ এলাকায় প্রযোজ্য তেমনি লক্ষ গুণের ফযীলতটি শুধু নামাযের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং হারাম শরীফের মধ্যে কৃত যে কোন ইবাদতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রমাণের জন্য দেখুন ইবনে আব্বাস রাযি.এর সূত্রে বর্ণিত আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইনের ১৬৯২ নং হাদীস। যার আরবী পাঠ এই –

عن اسمعيل بن ابى خالد عن زاذان قال مرض ابن عباس مرضا شديدا فدعا ولده فجمعهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبع مائة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال بكل حسنة مائة الف حسنة. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

আরও দেখুন : আল-মউসূআতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ১৭/২০১, গুনয়াতুন নাসিক; পৃষ্ঠা ১৪৩)

কিন্তু নিজ অজ্ঞতা সম্পর্কেও অজ্ঞ এবং অতিকায় ক্ষুদ্র দৃষ্টিসম্পন্ন কিছু লোক বেশি ফযীলত সম্পন্ন কোন আমলের বর্ণনা শুনলেই কেন জানি অন্তরজ্বালায় ভোগে। ভাবটা এমন যেন এত বেশি সওয়াব দান করলে আল্লাহ পাকের ভাণ্ডারে অভাব দেখা দিবে। (নাউযুবিল্লাহ)

প্রথম হজ্জের সফরে একদিন বাদ মাগরিব মসজিদে হারামের আন্ডারগ্রাউন্ডে বসে কিছু অযীফা পড়ছিলাম। দেশি ভাই মনে করে একভাই পাশে এসে বসলেন। পরিচয় পর্ব সেরে তিনি যখন অহেতুক কিছু প্রসঙ্গে কথা বলতে চাইলেন, আমি বললাম, ভাই! এসব অনর্থক গল্প না করে আমরা তাসবীহ-তাহলীল পড়ি। কারণ এখানে প্রত্যেক আমলের সওয়াব লক্ষগুণ বেশি। কথাটি শুনতেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন, হাজী সাব! আপনার ধারণাটা ভুল। লক্ষগুণের ফযীলত শুধু নামাযের ক্ষেত্রে; অন্য কোন আমলের ক্ষেত্রে নয়। আপনি ভালো কইরা জাইনা লইয়েন। বললাম, আমাকে মাফ করেন। সাথেই মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম। তখন মুসাফাহা করে হাজী সাহেব অন্যত্র গিয়ে বসলেন। মনে মনে ভাবলাম, এ লোক সম্ভবত কোন উল্লু'র পাল্লায় পড়েছে। উল্লু মানে পেঁচা। ফুলে-ফলে সুশোভিত কোন বাগানে পেঁচার আগমন ঘটলে অন্য সকল পাখি অন্যত্র চলে যায়। ফলে সে বাগান আর পাখ-পাখালির কলকাকলিতে মুখরিত থাকে না। এ মর্মে উর্দূ ভাষায় একটি ছন্দ প্রসিদ্ধ আছে, খারাবীয়ে বাগ কে লিয়ে যব একহী উল্লু কা-ফী হ্যায় + হার শা-খ্ মেঁ উল্লু বয়ঠা হ্যায় তো আঞ্জামে গুলিস্তাঁ কিয়া হোগা!

অর্থ : বাগান উজাড় হওয়ার জন্য একটি পেঁচাই যখন যথেষ্ট। প্রতিটি ডালে পেঁচা বসে আছে; তো বাগানের কী দশা হবে?

মানুষের মাঝে আজ এমন অনেক উল্লুর আবির্ভাব ঘটেছে। যে কোন বংশে বা সমাজে এমন উল্লু একজন হলেই যথেষ্ট। বে-আমল লোকদেরকে নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। নামায না পড়লে আপত্তি নেই; কিন্তু সালাতুত তাসবীহ আর আউয়াবীন পড়লে সর্বনাশ। কারণ এ ধরনের নামাযের হাদীস বুখারী শরীফে নেই। এমন বাতিকগ্রস্ত লোকেরাই বলে থাকে, হারাম শরীফে লক্ষগুণের ফযীলতে নামায ছাড়া অন্য আমলের উল্লেখ বুখারী-মুসলিমে নেই। কাজেই অন্য আমলের ক্ষেত্রে এ ফযীলত আশা করা ঠিক নয়। ফযীলত যেন বাপ-দাদার গোলার ধান– সব আমলের ক্ষেত্রে হলে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে! অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করির এ একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

তাই সাধারণ হাজী সাহেবানদের প্রতি আমার আরয! দীনের কোন ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আলেমের কথার বাইরে যাবেন না। হাদীস-তাফসীর ও ফিকহ সবক্ষেত্রেই আলেমগণ অনুসরণীয়। তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য। অন্যরা আলেমদের বরাতে কথা বলতে পারবে। স্বতন্ত্রভাবে বললে গ্রহণযোগ্য হবে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী বে-আলেম ফতওয়া দাতা নিজেও পথভ্রষ্ট; যে তার ফতওয়া মানবে সে-ও পথভ্রষ্ট হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১০০)

ফিরে আসি আগের কথায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাকে অল্প আমলে সীমাহীন বিনিময় দেয়ার জন্য স্থান-কালের যে সকল বাহানা রেখেছেন পবিত্র মক্কা-মদীনায় অবস্থানকালীন সময় সে সবের মধ্যে অন্যতম। সেখানে মুসাফিরগণের হাতে সময়ও থাকে পর্যাপ্ত। কিন্তু পূর্ব প্রস্তুতি ও সৎসঙ্গের অভাবে সে সুবর্ণ সময়েও অনেক মুসাফিরের প্রাপ্তি থাকে খুবই নগন্য।

অনেক ভাইকে দেখেছি সময় এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কুরআন তিলাওয়াত না করে ঝিমুচ্ছেন কুরআন শরীফের শেলফের পাশে বসেই। কারণ তিনি আরবী কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে শেখেননি। অথবা শিখেছেন তো কলিকাতার ছাপা। কলিকাতার ছাপা তো সেখানে নেই। ঝিমুচ্ছেন আর আফসোস করছেন যে, আগে জানলে তো এক জিল্দ কলিকাতার ছাপা নিয়ে আসতে পারতাম। আর এটা চোখে পড়ে আমাদের বাংলাদেশী হাজীদের ক্ষেত্রেই। অন্যান্য দেশের মুসলমান জনসাধারণের প্রায় সকলেই কুরআন শরীফ পড়তে জানেন এবং আরবী ছাপাতেই পড়তে পারেন। কাজেই হারাম শরীফের অবসর সময় তারা প্রায় কুরআন শরীফ

তিলাওয়াতেই কাটিয়ে থাকেন। বড় ভাগ্যবান তারা!

আমাদের দেশের জনসাধারণেরও উচিত কুরআন শরীফের আরবী তিলাওয়াত শিখে নেয়া। আমার ধারণায় আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় কুরআনে পাকের উচ্চারণের এই গলত প্রচেষ্টা শুধু বাংলাভাষীরাই করে থাকে। আরবী তিলাওয়াত না জানার কারণে তারা কোন অযীফা ও দু'আ দুরূদের বইও পড়তে পারে না। দুনিয়ার সব সম্ভব; কিন্তু কুরআন পাকের তিলাওয়াত সম্ভব নয়– এটা কেমন হঠকারিতা!

কাজেই বিশেষ করে হাজী সাহেবানরা অন্তত হজ্জের পূর্বে বয়স্ক হারদুঈ প্রশিক্ষণ বা নূরানী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিংবা বিশেষ শিক্ষকের কাছে নিয়মিত পড়ে সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শিখে নিবেন। পূর্ণ কুরআন শরীফ সম্ভব না হলে অন্তত ছোট সূরাগুলো এবং অতি ফযীলতপূর্ণ বড় কয়েকটি সূরা– সূরা ইয়াসীন, মুলক, হা-মীম সিজদাহ, ওয়াকিয়া, আর-রহমান এই সূরাগুলো সহীহ করে নিবেন।

আর কলিকাতার ছাপায় পড়তে অভ্যস্ত হলে যাওয়ার পূর্বে গিলাফসহ ছোট সাইজের এক জিল্দ কুরআন শরীফ সংগ্রহ করে হাতব্যাগে করে নিয়ে যাবেন। মা-বোনদের জন্য তো কুরআন শরীফ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া খুবই জরুরী। কারণ তারা বেশিরভাগ সময় বাসায় থাকবেন। তখন তিলাওয়াতের মধ্যেই যেন তাদের বেশি সময় কাটে। সাথে সাথে সকল হাজী সাহেব নির্ভরযোগ্য দু'আ ও অযীফার বইও সঙ্গে নিবেন। এক্ষেত্রে হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. সংকলিত মুনাজাতে মাকবূল অন্যতম। হামীদিয়া লাইব্রেরী, আল-কাউসার প্রকাশনী ও মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশিত মুনাজাতে মাকবূল সংগ্রহ করে নেয়া উচিত। এছাড়া হজ্জের ফাযাইল ও মাসাইল সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য দুয়েকটি বই সঙ্গে নিবেন। মুসলমানের সর্বাপেক্ষা দামী সম্পদ ঈমানের হিফাযত ও সংশোধনের জন্যে হযরত মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. লিখিত কিতাবুল ঈমান, আর আত্মার সংশোধনের জন্যে ইমাম গাযালী রহ. লিখিত তাবলীগে দীন কিতাবদ্বয় সঙ্গে রাখা ও অবসর সময়ে পড়া খুবই জরুরী।

দ্বিতীয়ত : ভিড়ের সময়ে আগ্রহ থাকলেও বেশি বেশি তাওয়াফ করা সম্ভব হয় না। সে সময়ে নফল ই'তিকাফের নিয়তে যত বেশি নফল ইবাদত করা যায় ততই লাভ। বিশেষ করে নফল নামায– ইশরাক, চাশত, আউয়াবীন, তাহাজ্জুদ, সালাতুত তাসবীহ ইত্যাদি যেন ছুটে না যায়। তবে মাকরূহ সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। ফজরের আযান থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের ফরযের পূর্বের দু' রাকাআত সুন্নাত ছাড়া অন্য নফল-সুন্নাত পড়া মাকরূহ। অনুরূপ আসরের ফরযের পরেও। মাগরিবের আযানের পর হাম্বলী ও শাফেয়ী মাযহাবের লোকেরা দু' রাকাআত নফল পড়ে থাকে। হানাফী মাযহাব মতে এ সময়ে নফল না পড়ার মধ্যেই সতর্কতা। কারণ কোন কোন হাদীসে এ সময়েও নফল পড়তে নিষেধাজ্ঞা আছে। আর অধিকাংশ সাহাবীগণ এ সময়ে নফল পড়তেন না। কাজেই আমরা সতর্কতার উপরেই থাকব। তাছাড়া নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকলেও তো নফল নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়। তার সাথে তাসবীহ ও যিকিরে রত থাকলে তো কথাই নেই। তাহলে কেন অসতর্কতার ঝুঁকি নেব?

কেউ কেউ ধারণা করে, হারাম শরীফে যখন এক রাকাআতে একলক্ষ রাকাআত, সেখানে তো উমরী কাযা নামায পড়লে অল্পতেই অতীত জীবনের সব নামাযের কাযা হয়ে আরো কিছু অতিরিক্ত জমাও থাকতে পারে। কাজেই সেখানে গিয়ে উমরী কাযা পড়া উচিত।

ধারণাটা কিন্তু ভুল। কারণ, এক রাকাআতে একলক্ষ রাকাআত– এটা শুধু সওয়াবের বেলায়; কাযা নামাযের ক্ষেত্রে নয়। অন্যথায় জামে মসজিদে একদিন নামায পড়লে আর পাঁচশত দিন নামায না পড়লেও চলত। আর লাইলাতুল কদরে কোন নামায পড়তে পারলে তা সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত।

মোটকথা, সেখানে হাতে সময় থাকে। কাজেই যার অতীত জীবনে ফরয নামায কাযা আছে সে ঐ সময়ে বেশি বেশি কাযা আদায় করে বোঝা হালকা করতে চেষ্টা করবে। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে নেক হায়াতের জন্য দু'আ করবে, যেন ভবিষ্যতে কোন নামায কাযা না হয় এবং অতীত জীবনের ছুটে যাওয়া সকল ফরয-ওয়াজিবের কাযা-কাফ্ফারা আদায় করে কবরে যাওয়া যায়।

তৃতীয়ত : শারীরিক ইবাদতের মধ্যে রোযা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আমল। ফরয রোযা তো বটেই; রমাযান মাসে রোযার যত ফযীলত আলেমদের মুখে শুনি তার অধিকাংশ ফযীলত নফল রোযার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রোযার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও তাকওয়া অর্জিত হওয়া, জাহান্নামের আগুনের ক্ষেত্রে ও গুনাহের ক্ষেত্রে ঢাল স্বরূপ হওয়া– এ জাতীয় ফযীলত নফল রোযায়ও আশা করা যায়। কাজেই দেশে-প্রবাসে, শীতে-গরমে মাঝেমধ্যে নফল রোযাও রাখা চাই। বিশেষ করে চান্দ্রমাসের মধ্যবর্তী তিনদিন, সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবারে নফল রোযার অভ্যাস করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমল।

সম্মানিত হাজী সাহেবানদের মূল হজ্জের দিনসমূহ ছাড়া অন্যান্য দিনে যেহেতু উল্লেখযোগ্য কোন ব্যস্ততা থাকে না, কাজেই শরীর সুস্থ থাকলে অন্যান্য নফল বন্দেগীর সাথে নফল রোযা পালনের প্রতিও মনোযোগী হওয়া চাই। বিশেষ করে চান্দ্রমাসের মধ্যবর্তী তিনদিন এবং সপ্তাহে সোমবারে এবং বৃহস্পতিবারে রোযা রাখতে পারেন। আর যদি পবিত্র মক্কায় অবস্থানকালে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দু-তিনদিন নফল রোযা রাখা যায়, তাহলে হারামের লক্ষগুণের ফযীলত ও যিলহজ্জের প্রথম দশকের ফযীলত মিলে যে কী বরকতপূর্ণ আমল হবে– কল্পনা করলেই লোভ জাগার কথা! ওখানে সাহরী-ইফতার একদম সহজ! যমযমের পানি হাতের কাছেই-পকেটে কয়েকটা খেজুর থাকলেই হল। সাহরীর সময়ও তো সকলেই জাগ্রত, কাজেই এ সুযোগ কিছু হলেও কাজে লাগানো উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও তাওফীক দান করুন। আমীন। তবে কোন ক্রমেই স্বাস্থ্যের ঝুকি নেয়া যাবে না। কারণ আসল উদ্দেশ্য হজ্জ করা। এ কারণেই আরাফার দিনের রোযা হাজীদের জন্য উত্তম নয়।

চতুর্থত : হাদীসে পাকে এসেছে, কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা নফল ইবাদতের দ্বারা ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করবেন। সুতরাং সব ফরযের পাশাপাশি নফলের ইবাদতের একটা সঞ্চয় থাকা উচিত। এটা যেমন আত্মিক ও শারীরিক ইবাদতের ক্ষেত্রে, তেমনি আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রেও। কাজেই যাকাত, ফিতরা ও কুরবানীর পাশাপাশি নফল দান-সদকার প্রতিও কুরআন-সুন্নাহে অনেক বেশি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আমরা সব সময় এক্ষেত্রেও সাধ্যমত চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, পবিত্র হজ্জের সফরে নফল দান-সদকার সওয়াব ঠিক এমনই বৃদ্ধি পাবে, যেমন অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রে; বরং ক্ষেত্রবিশেষে তার চেয়েও বেশি।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান মক্কা-মদীনায় নফল দান-সদকার জায়গা কোথায়? প্রশ্নটা আসলেও জটিল! সেখানকার মসজিদ-মাদরাসার তো বর্তমানে আপনার দানের কোন প্রয়োজন নেই। আর ফকীর-মিসকীন যা দেখেন তার অধিকাংশই মূলত ফকীর-মিসকীন নয়; বরং কিছু টাউট-বাটপারও আছে। যাদেরকে দেখবেন, দু'হাতের কনুই বের করে হাত কাটার ভান করে 'হাজী বাবা ফী সাবীলিল্লাহ' বলে ভিক্ষা করছে, তাদের সকলেরই দুই হাত পূর্ণ সুস্থ আছে। আপনার বিশ্বাস না হলে এদের কারো ঘাড়ের কাছে হঠাৎ করে হাত দিয়ে দেখবেন; বুঝবেন, প্রতারণা কাকে বলে! আর বাকীদের ব্যাপারেও শুনেছি, তারা নিজ নিজ দেশে বাড়ি-গাড়ির মালিক! সেখানকার পরিচ্ছন্নকর্মী আমাদের বাঙ্গালী ভাইয়েরাও দান-খয়রাত বিশেষ করে যাকাত-ফিতরা বা কাফফারার যোগ্য বলে মনে হয় না। তাহলে একটাকায় লক্ষ টাকা দান করার সওয়াব কিভাবে পাওয়া সম্ভব? শুনেছি, এ সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের এক বুযুর্গ নিজ মাদরাসার রসিদ বই সাথে রাখেন। কেউ দানের বিষয়ে পরামর্শ চাইলে তিনি হারামে বসে নিজ মাদরাসার লিল্লাহ ফান্ড বা নির্মাণ ফান্ডের জন্য দান গ্রহণ করে রসিদ প্রদান করে দেন। চমৎকার সমাধান! গত বছর হজ্জের সফরে আমিও দান করতে উদ্যোগী আমার সাথীদেরকে এমন পন্থায় দান করতে সহায়তা করেছি। অবশ্য আমার কাছে রসিদ বই ছিল না। কাগজে লিখে রেখেছি এবং দেশে ফিরে রসিদের মাধ্যমে আমাদের মাদরাসায় তাদের দানের অর্থ জমা করে দিয়েছি। আশা করি তাদের সকলেই হারাম শরীফে দান করার সওয়াব পেয়ে যাবেন। এক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, কেউ কেউ হারাম শরীফে কুরবানীর সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে হাজী সাহেবদের মাধ্যমে হারামে কুরবানীর জন্য অর্থ প্রেরণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে অবশ্য আমার মনের খটকা এখনো দূর হয়নি যে, হারাম শরীফে কুরবানীর সওয়াব না হয় লক্ষগুণ পাওয়া গেল, কিন্তু সে কুরবানীটি দেশের কোন মাদরাসায় হলে আর তালিবে ইলমরা সেই কুরবানীর গোশত খেতে পারলে যে সওয়াব হত, সেটা সেই লক্ষগুণের চেয়ে বেশি হত, না কম হত? হারাম শরীফে তো সেই কুরবানীর গোশত কে খেল তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আমার কেন জানি মনে হয়, ঐ কুরবানীটি দেশের কোন মাদরাসায় করিয়ে আলেম ও তালিবে ইলমদেরকে খাওয়ালে হারামে ঐ কুরবানীর চেয়েও বেশি সওয়াব হবে। বাস্তবতা আল্লাহই ভালো জানেন।

পঞ্চমত: মক্কায় অবস্থানকালে হজ্জের আগে বা পরে নফল উমরা করা। নির্ভরযোগ্য সকল আলেমের মতে এটিও একটি সওয়াবের কাজ। হ্যাঁ এতে সন্দেহ নেই যে, বেশি উমরার পরিবর্তে বেশি তাওয়াফে সওয়াব বেশি। বিশেষ করে হজ্জ যখন অত্যাসন্ন তখন উমরা করে ক্লান্ত না হয়ে হজ্জের জন্য শক্তি ও উদ্যম সঞ্চিত রাখা চাই। কিন্তু তাই বলে মক্কায় থাকাকালে হারামের বাইরে থেকে যথা মসজিদে আয়েশায় গিয়ে ইহরাম করে উমরা করলে কোন সওয়াব হবে না বা গুনাহ হবে– এমন কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ কথাগুলো ঐ উল্লুর দলেরা বলে থাকে, যারা নিজ অজ্ঞতার সীমালঙ্ঘন করে আলেমদের প্রতিপক্ষ হয়। কাজেই হাজী সাহেবগণ এদের কথায় কান দিবেন না। মনে চাইলে, স্বাস্থ্যে কুলালে এক-দুটো নফল উমরা করবেন। নিজের নামেও করতে পারেন, জীবিত কিংবা মৃত অন্য কারো নামেও করতে পারেন। বিশেষ করে যারা হজ্জের বেশ আগে থেকেই মক্কা শরীফে অবস্থান করবেন তারা এক-দুটো উমরা করে নিলে কিছুটা হজ্জের রিহার্সেলও হয়ে যায়। আর হজ্জের পরে সুযোগ হলে তো করবেনই। তবে মনে রাখবেন, হজ্জের পরপর নফল উমরায় প্রচণ্ড ভীড়ে খুব কষ্ট হয়। এজন্য সম্ভব হলে সপ্তাহ খানেক পর করলে ভালো হবে।

এ সকল নফল কাজের পাশাপাশি অন্যকে ঈমান-আমলের দাওয়াত দেয়ার কথা যেন ভুলে না যাই। কারণ এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ সৎকাজের আদেশ ও গুনাহের কাজে নিষেধ করা। তথা দাওয়াত ইলাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরামের জীবনের মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল এটি। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময়ে আরাফার ঐতিহাসিক ভাষণে উম্মতের প্রত্যেক প্রজন্মকে এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সুতরাং পবিত্র হজ্জের সফরে যেমন সময় সুযোগ বুঝে এ কাজ আঞ্জাম দিতে ভুলবে না, তেমনি হজ্জের সফর শেষে দেশে ফিরে এসে হক্কানী আলেমদের পরামর্শক্রমে এ কাজের সাথে নিজেকে ওঁতপ্রোতভাবে জুড়ে দিবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

লেখক : নায়েবে মুফতী,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

মেসার্স রাজিব এন্টারপ্রাইজ

প্রো. হাফেজ মাওলানা রহমতুল্লাহ

সরাসরি সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও জাফলং থেকে গুণগত মানসম্পন্ন

পাথর ও সিলেকশন বালু

সরবরাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সিঙ্গেল, বোল্ডার ভাঙ্গা, ভুতু ভাঙ্গাসহ সর্বপ্রকার নির্ভেজাল ও কোয়ালিফাইড পাথর
এবং সিলেকশন বালু সুলভ মূল্যে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

ঢাকা অফিস
৪১/৯ সি হাজী আফসার উদ্দীন লেন
ঝিগাতলা, ধানমণ্ডি, ঢাকা
০১৭১৬৭১০৭১১

ভোলাগঞ্জ অফিস
শাকুরা পাম্পের দক্ষিণে
কোম্পানীগঞ্জ ভোলাগঞ্জ, সিলেট
০১৮১৬৪৩৮৮১২

মুসলমানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন কেন জাযীরাতুল আরবে হল?

মাওলানা আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্র কাশিতের পর)
ভৌগলিক দিক থেকে 'জাযীরাতুল আরব' বা আরব উপদ্বীপ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এর পশ্চিম দিকে রয়েছে লোহিত সাগর, দক্ষিণ দিকে ভারত মহাসাগর (আরব সাগর ও এডেন উপসাগর), পূর্ব দিকে আরব উপসাগর ও ওমান উপসাগর এবং উত্তর দিকে শামের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল। তিনদিক থেকে পানি বেষ্টিত হওয়ায় এ অঞ্চলকে রূপক অর্থে 'জাযীরা' (সাগরের উপদ্বীপ) নামে নামকরণ করা হয়।

তৎকালীন সময়ে জাযীরাতুল আরব সর্বমোট পাঁচটি অঞ্চলের সমষ্টি ছিল- হিজায, তিহামা, নায্দ, আরুয, ইয়ামান। (বর্তমানে 'জাযীরাতুল আরব' বলতে সৌদি আরব, ইয়ামান, ওমান, আরব আমীরাত, কুয়েত, কাতার ও বাহরাইনকে বোঝানো হয়।) 'হিজায' অঞ্চলটি ছিল লোহিত সাগরের (পূর্ব) তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা জাযীরাতুল আরবের পশ্চিম দিকের উঁচু পাহাড়ী অঞ্চল, যাকে 'সিল্‌সিলাতু জিবালিস্ সারাহ্' (সারাহ পাহাড় শ্রেণী) বলা হয়। এর ব্যাপ্তি ছিল 'ইয়ামান থেকে নিয়ে আকাবা উপসাগর ও শামের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত। 'নয্দ' এবং 'তিহামা' কে বিভাজন করায় এ অঞ্চলকে 'হিজায' (বিভাজনকারী) নামে আখ্যায়িত করা হয়। হিজাযের এই পাহাড়শ্রেণির মধ্য হতে দুটি হলো 'জাবালে আবি কুবাইস' এবং 'জাবালে আরাফ' বা 'জাবালে আহমার'। এ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নগরী হলো মক্কা। হিজাযের পবিত্র এই মক্কা নগরীতেই উদিত হয়েছিল আখেরী নবীর নবুওয়াত রবি...!

چہ خوش صحرا کہ شامش صبح خنداست- شبش کوتاہ و روزاو بلنداست

অর্থ : বড় ভাগ্যবান সে মরু বিয়াবান! সন্ধ্যা যে তার স্নিগ্ধ সকাল। রাত্রি ছোট, দিন সুমহান!

(ড. শাওকী আবূ খলীল রচিত 'আতলাসুস্ সীরাতুন্নাবাবিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ১৭-১৯, আল্লামা ইয়াকুত হামাবী কৃত মু'জামুল বুলদান ২/১৫৯, আলী মিয়া নদভী কৃত আস্‌সীরাতুন্ নাবাবিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ১০৯, ১৩৪)

আরবের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য

সুবিধাজনক ভৌগলিক অবস্থান : ইসলামের সার্বজনীনতার স্বার্থে বিশ্বব্যাপী এর দাওয়াতকে দ্রুততম সময়ে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন একটি ভূখণ্ড, ভৌগলিক বিবেচনায় বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তসীমার তুলনায় যার অবস্থান হবে সহজে অতিক্রম্য ও সমান দূরত্বে। আরব ভূখণ্ড সন্দেহাতীতভাবে এ দু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল।

এ ভূখণ্ড এশিয়ার অংশ হয়েও আফ্রিকা ও ইউরোপের নিকটবর্তী ছিল। পাশাপাশি তৎকালীন সময়ের দুই পরাশক্তি পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যও ছিল নিকটবর্তী দূরত্বে। ভৌগলিক এ সুবিধাজনক অবস্থানের কারণেই ইসলামের দাওয়াত স্বল্পতম সময়ে একদিকে যেমন পৌঁছে গিয়েছিল ইরাক, ইরান, তুর্কিস্তান, খোরাসান, কাবুল ও হিন্দুস্তান পর্যন্ত, তেমনই একই সাথে পৌঁছে গিয়েছিল শাম, মিসর, আফ্রিকা, তিউনেশিয়া ও স্পেন পর্যন্ত। সাগরপথে স্বল্পতম সময়ে এ দাওয়াত যেমনিভাবে পৌঁছে গিয়েছিল আফ্রিকার দ্বীপরাষ্ট্রসমূহ, ইথিওপিয়া, এবং চীন পর্যন্ত, তেমনই পৌঁছে গিয়েছিল সাইপ্রাস এবং সিসিলি পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, বরং ভৌগলিক এ সুবিধা একই সাথে একই সময়ে দুই পরাশক্তি পারস্য ও রোমের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হতে সগযোগিতা যুগিয়েছিল এবং বিস্ময়করভাবে খুব সহজেই এ দু-পরাশক্তি আরবদের ঈমানের কাছে পদানত হতে বাধ্য হয়েছিল। 'কুদরতের' এ নির্বাচন সত্যিই বড় বিস্ময়কর! (আলী মিয়া নদভী কৃত 'আস্‌সীরাতুন্ নববিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ৯৯, আল্লামা শিবলী নো'মানী ও সুলাইমান নদভী কৃত 'সীরাতুন্নবী ৪/৬২৫)

ভাষার ঐক্য : বিশ্ব দরবারে সর্বজনীন ইসলামের দাওয়াতকে দৃঢ়ভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল দাওয়াতের কেন্দ্রে এর সুদৃঢ় অবস্থান। এক্ষেত্রে আবেগ-অনুভূতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক 'ভাষা'র ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আরব ভূখণ্ড- যা আয়তনে বর্তমানের একটি মহাদেশের সমান ছিল- এতটা বিশাল হওয়া সত্ত্বেও আঞ্চলিক সুর/টান ও উচ্চারণনীতিতে ভিন্নতা থাকলেও মৌলিকভাবে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের সকলের ভাষা ছিল আরবী। ভাষাগত ঐক্যের বাড়তি সুবিধার দরুন ইসলাম তার কেন্দ্রে খুব দ্রুত প্রসার লাভ করে সুদৃঢ় অবস্থানে পৌঁছে যায়। (আলী মিয়া নদভী কৃত 'আস্‌সীরাতুন্ নববিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ১১৩)

নবুওয়াতের ধারক-বাহক হওয়ার ক্ষেত্রে আরবজাতির অনন্য বৈশিষ্ট্য

সঠিক বংশ পরম্পরা : সম্ভ্রান্ত বংশধারা উত্তরসূরীর জন্য সম্মান ও গৌরবের কারণ। একজন নবীর জন্য এ গৌরব অত্যাবশ্যক। নিজ বংশে শেষ নবীর আগমনের জন্য ইবরাহীম আ. যে দু'আ করেছিলেন, সে দু'আ কবুল হওয়ার জন্য আবশ্যক ছিল নবী ইবরাহীমী বংশের ধারার সঠিক সংরক্ষণ। আরবরা এ ঐতিহ্যের যথার্থ ও একমাত্র মুহাফিয ছিল। বংশলতিকা সংরক্ষণের ব্যাপারে তারা এতটা পারঙ্গম ছিল যে, তারা নিজেদের বংশের সাথে সাথে ঘোড়া, উট প্রভৃতি জানোয়ারের বংশধারা পর্যন্ত সংরক্ষণ করতো এবং তাদের এ যোগ্যতা বিভিন্ন মজলিসে কবিতার ছন্দে ভাস্বর হয়ে উঠতো। আরবদের এ বংশধারা সংরক্ষণের বিষয়টি অনারবরাও স্বীকার করতো। হযরত উমর ফারূক রাযি. এর খেলাফতকালে কাদিসিয়া যুদ্ধের প্রাক্কালে পারস্য সেনাপতি রুস্তম এ সত্যের স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিল, 'আরবরা বাহ্যিক বেশভূষা এবং খাদ্যাহারে সারল্য গ্রহণ করে এবং বংশ ও আভিজাত্য সংরক্ষণ করে...!' (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৭/৪৭, আল্লামা শিবলী নো'মানী ও সুলাইমান নদভী কৃত সীরাতুন্নবী ৪/৬২৪)

আরবজাতি ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারার ইতিহাস

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরব জাতি তিন শ্রেণীর-

১. العرب العاربة (আরিবা) : ইসমাইল আ. এর পূর্ববর্তী আরবজাতি, যাদের মধ্যে আদ, সামূদ, জুরহুম ছিল অন্যতম।
২. العرب المستعربة (মুসতা'রিবা) : যারা হযরত ইসমাঈল আ. এর বংশধর।

এদের আদিনিবাস ছিল 'হিজায'। 'রবীআ' এবং 'মুযার' গোত্রদ্বয়ের মাধ্যমে তাদের বংশধারা অব্যাহত ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুযার' গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. العرب المتعربة (মুতাআর্‌রিবা) : যারা 'কৃহতান' নামক এক ব্যক্তির বংশধর। 'সাবা' এবং 'হাযরামাউত' দু'টি শাখার মাধ্যমে তাদের বংশধারা অব্যাহত ছিল। এদের আদিনিবাস ছিল 'ইয়ামান'।

কারো কারো মতে 'কৃহতান' হযরত ইসমাইল আ. এর বংশধর ছিল। সে হিসেবে 'মুসতা'রিবা' এবং 'মুতাআর্‌রিবা' তথা হিজাযের আদি নিবাসী সকল আরব (স্বল্পসংখ্যক বহিরাগত ইয়াহুদী ব্যতীত) হযরত ইসমাইল আ. এর বংশধর। হাফেয ইবনে হাজার আসকলানী রহ. এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/১৭০-১৭১, ফাতহুল বারী ৬/৬৬৬ [৩৫০৭], সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী কৃত 'আস-সীরাতুন্নাবাবিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ১১২)

ভিন্ন ধর্মের প্রভাবমুক্ত : হযরত ইবরাহীম আ. এর 'দীনে হানীফ'কে পূর্ণতা দানের নিমিত্তে আগমনকারী শেষ নবীর সঙ্গদানের জন্য প্রয়োজন ছিল এমন একটি জামাআতের, যারা ভিন্ন ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে দীনে হানীফের সাথে পরিচিত থাকবে। কেননা, একথা স্বীকৃত যে, 'জাহেল' (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিছক অজ্ঞ) এর সংশোধন যতটা সহজ, 'জাহেলে মুরাক্কাব' (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিকৃত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি) এর সংশোধন ঠিক ততটাই কঠিন।

এ বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় আরবরা একক ও অনন্য ছিল। আমল-আখলাকে ত্রুটি থাকলেও বিকৃত কোনো ধর্মবিশ্বাস তাদের মন-মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলতে পারেনি। মূর্তিপূজা যদিও তাদেরকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ফেলেছিল, তদুপরি প্রতিবেশি রাষ্ট্রের ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজকদের বিকৃত ধর্মবিশ্বাস তাদের মন-মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। যে ক'জন ভালো মানুষ সে সময় পাওয়া যেত, তারা ভিন্ন ধর্মের পরিবর্তে নিজেকে দীনে ইবরাহীমের দিকে সম্পৃক্ত করতো। পক্ষান্তরে পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ড তখন কোনো না কোনো বিকৃত ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে বেঁচে ছিল। (আল্লামা শিবলী নো'মানী ও সুলাইমান নদভী কৃত সীরাতুন্নবী ৪/৬২৪)

বীরত্ব ও বাহাদুরী : বিশ্বসমাজের অধঃপতনের প্রলয়ংকারী স্রোততরঙ্গ রুখে দিয়ে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল এমন কিছু মর্দে মুজাহিদের, যাদের বীরত্ব ও সাহসিকতা পাহাড়ের উচ্চতা, সমুদ্রের গভীরতা, মরুভূমির ভয়ঙ্কর রুক্ষতা, সমরাস্ত্রের আধুনিকতা আর প্রতিপক্ষের আধিক্যকে হার মানিয়ে স্নিগ্ধ ভোরের নির্মল জ্যোতির ন্যায় ইসলামকে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে দিবে। তৎকালীন সময়ে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য দুর্ধর্ষ হিসেবে স্বীকৃত হলেও ব্যক্তিগত আত্মমর্যাদা, বীরত্ব, পৌরুষ ও সাহসিকতার ঐতিহ্য ছিল আরবদের বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত 'মীরাস'। নিজ আদর্শের তরে জান বিলিয়ে দেয়া আর আপন স্বার্থরক্ষার জন্য অন্যের প্রাণ কেড়ে নেয়া তাদের নিত্য বিনোদন ছিল। আরবদের এ অতুলনীয় বীরত্ব ও সাহসিকতাই ঝঙ্কৃত হয়েছিল বদর যুদ্ধে হযরত সা'আদ ইবনে উবাদা রাযি. এর কণ্ঠে-

والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا

অর্থ : পবিত্র ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! (হে আল্লাহর রাসূল!) যদি আপনি আমাদেরকে সওয়ারী নিয়ে সমুদ্রবক্ষে প্রবেশ করার আদেশ করেন, তবে আমরা সমুদ্রের গভীরেই প্রবেশ করবো। আর যদি আমাদেরকে আমাদের সওয়ারী 'বারকুল গিমাদ' পর্যন্ত হাঁকাতে আদেশ করেন, তবে আমরা এ আদেশ অবশ্যই পালন করবো।

এ বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রবল স্রোত যখন ঈমানের গতিপথ পেয়ে গেলো, তখন তার প্রভাবে হাজার বছরের পরাশক্তি রোম-পারস্যের ইতিহাস এক নিমেষে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে সময় লাগলো না।

সত্যবাদিতা : সত্যের দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে দা'য়ীর জন্য সত্যবাদিতার গুণে গুণান্বিত হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। শারীরিক বীরত্ব ও সাহসিকতা তাদের অন্তরকেও সাহসী করে তুলেছিল। এ কারণেই কাফের অবস্থায় নবীজীর বিরোধী শিবিরের হয়েও আবূ সুফিয়ান রোমের বাদশাহ কায়সারের সামনে নবীজীর ব্যাপারে সত্য সত্য বিবৃতি দিয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭)

বিচক্ষণতা ও সৃজনশীল সাহিত্য প্রতিভা : বিশ্ব নেতৃত্বের বাগডোর হাতে তুলে নেয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল ইসলামের ঝাণ্ডা এমন এক জাতির হাতে তুলে দেয়া হবে, যারা বিচক্ষণতা, সৃজনশীলতা, সাহিত্য প্রতিভা ও বিজ্ঞতার বিচারে বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম এবং আসমানী গ্রন্থের ভাষাশৈলির অলঙ্কারিত্ব ও যাদুময়তার সঠিক অনুধাবনে পারঙ্গম। আরবরা যদিও অক্ষরজ্ঞান থেকে অজ্ঞ ছিল, তদুপরি এ দুই যোগত্য তাদের মাঝে সুপ্ত ছিল। তাদের বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা এবং সৃজনশীল মননশীলতা তাদের ব্যক্তিত্বকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। তাৎক্ষণিক তৈরিকৃত সর্বোচ্চ সাহিত্যমানের সৃজনশীল কবিতা, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষার যাদুময়তা আজও আরবী সাহিত্যপ্রেমিদের জন্য বিস্ময় হয়ে আছে! আরবদের সে সাহিত্য প্রতিভার উপর ভর করেই কুরআনের উচ্চ সাহিত্যমান ও হিদায়াত নির্দেশনা উম্মত প্রাপ্ত হয়েছে।

রোম-পারস্যসহ বিশ্বসভ্যতার প্রাণকেন্দ্ররূপে বিবেচিত পরাশক্তিগুলোর সাথে বেদুইন আরবদের মতবিনিময়, চিঠিপত্র আদান-প্রদান, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সময়োপযুগী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিচক্ষণতা আজও বিস্ময় সৃষ্টি করে। যে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বকরী চরাতে পারতেন না, তিনি কী করে রোম-পারস্যের মত দুর্ধর্ষ জাতিদ্বয়কে পদানত করলেন- এ প্রশ্নের উত্তর ঐতিহাসিকরা আজও খুঁজে পায়নি...!

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি : কুরআন-হাদীসের মর্মবাণীর সঠিক অনুধাবন, ধারণ এবং পূর্ণাঙ্গ ও অবিকৃতরূপে অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রখর ধী-শক্তিসম্পন্ন একটি জাতির। কেননা, কোনো বিষয় সংরক্ষণের জন্য স্মৃতিশক্তি যতটা নিরাপদ, সহজ ও কার্যকরী পন্থা, লিখনী পদ্ধতি ঠিক ততটাই অনিরাপদ ও জটিল পন্থা।

আরবদের অসাধারণ ধী-শক্তি ছিল প্রবাদতুল্য। বৃহৎ কলেবর বিশিষ্ট কবিতাগুচ্ছ একবার শুনেই না লিখে তা মুখস্ত করে ফেলা, উট-ঘোড়ার বংশধারা পর্যন্ত কণ্ঠস্থ রাখা তাদের এ প্রতিভার সাক্ষ্য দেয়। আরবদের এ অসাধারণ স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করেই কুরআন-হাদীসের স্বচ্ছতা ও নির্মলতা আজও পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান রয়েছে।

দানশীলতা ও বদান্যতা : নববী কাজের 'আলমবরদার' হওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় অকৃপণ দানশীলতার মানসিকতা। কেননা, সম্পদের লোভ মানুষকে ভীরু, কাপুরুষ

এবং অলস ও অকর্মণ্য করে তুলে। দানশীলতা ও বদান্যতা ছিল আরবদের ঐতিহ্য এবং গৌরবের বিষয়। আর তাদের মেহমানদারী তো এখনও দৃষ্টান্তহীন! দানশীলতার ব্যাপারে তারা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো এবং কবিতার ছন্দমালায় এ গৌরবের স্মৃতিকে স্বরণীয় করে রাখতো। কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময় হযরত আবূ বকর রাযি. এর মালিকানাধীন সকল সম্পদ দান করে দেয়া, হযরত উমর রাযি. এর অর্ধেক সম্পদ দান করা, দুর্ভিক্ষের সময় হযরত উসমান রাযি. এর একশত উটভর্তি শস্য বিনামূল্যে মদীনাবাসীদের মধ্যে দান করে দেয়া, স্বল্পখানায় মেহমান যেন পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পারেন- এ জন্য মেযবান কর্তৃক বাতি নিভিয়ে দেয়া আরবদের সে বদান্যতা আর দানশীলতারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

দার্শনিক চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত : 'কিন্তু, কেনো, কীভাবে, সম্ভব নাকি অসম্ভব?' এ জাতীয় দার্শনিক প্রশ্নোত্তর ব্যক্তিকে আমল থেকে ক্রমেই দূরে সরিয়ে দেয়। এ কারণেই 'ঈমান বিল-গাইব' সংবলিত দীন ইসলামের প্রসারের জন্য এ গুণটি আবশ্যক ছিল যে, এর ধারক বাহক দার্শনিক প্রশ্নোত্তরে নয়; বরং কাজে বিশ্বাসী হবে। আরবদের মাঝে এ গুণটির বিকাশ ঘটেছিল অতি উত্তমরূপে। গ্রাম্য আরব বেদুইনরা নবীজীর দরবারে আসতেন। দু-চার প্রশ্ন করেই একথা বলে ফিরে যেতেন যে,

والله لا أزيد على هذا ولا أنقص

অর্থ : ইয়া রাসূলুল্লাহ! খোদার কসম! আপনি যা বলেছেন, আমি তা যথাযথ আমল করবো। আমলের ক্ষেত্রে কোনো বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস করবো না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৬)

আখেরী নবীর সহচর এবং সাহাবী হওয়ার জন্য উল্লিখিত গুণাবলীর কোনো বিকল্প ছিল না, যার একক ধারক-বাহক ছিলেন জাযীরাতুল আরবের আরবজাতি। সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ. বলেন, সব ধরনের ভ্রষ্টতা সত্ত্বেও এই ভালো গুণগুলো তাদের (আরবদের) মাঝে এজন্য 'আমানত' রাখা হয়েছে, যখন 'খোদায়ী বাদশাহী'র সময় আসবে, তখন যেন তাদের স্বভাবজাত যোগ্যতার এ পুঁজি খোদায়ী বাদশাহীর সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য 'খাযানায়ে গাইব' (সুপ্ত ভাণ্ডার) এর দায়িত্ব পালন করতে পারে। এ যোগ্যতাগুলো এমন সম্পদ ছিল, যা না হিন্দু অনারবদের মাঝে ছিল, না রোম ও ফিরিঙ্গিদের মাঝে ছিল, না তুর্কিদের মাঝে ছিল...! (সীরাতুন্নবী ৪/৬২৮)

নবীজীর বংশ পরম্পরা

اکرم به نسبا طابت عناصره اصلا وفرعا وقد
سادت به البشر
مطهر من سفاح الجاهلية لا يشوبه قط لا
نقص ولا كدر

অর্থ : তাঁর বংশ কতই না সম্মানিত! তিনি পবিত্র, মূল এবং শাখা-উভয় দিক থেকে! তাঁর কারণেই মানুষ 'মর্যাদা'র আসনে অধিষ্ঠিত!

তাঁর বংশ জাহিলিয়্যাতের 'অশ্লীল কর্ম' থেকে মুক্ত, তিনি সকল অপূর্ণতা এবং অস্বচ্ছতা থেকে নিষ্কলুষ-পবিত্র!

পিতার দিক থেকে বংশধারা : মুহাম্মাদ- আব্দুল্লাহ- আব্দুল মুত্তালিব- হাশেম- আবদে মানাফ- কুসাই- কিলাব- মুর্‌রা- কা'ব- লুওয়াই- গালেব- ফিহ্‌র- মালিক- নযর- কিনানা- খুজাইমা- মুদরিকা- ইলয়াস- মুযার- নেযার- মাআদ- আদনান। আদনান পর্যন্ত বংশপরম্পরায় কোনো মতবিরোধ নেই। তবে আদনান থেকে নিয়ে হযরত ঈসমাঈল আ. পর্যন্তের সংখ্যা এবং নাম নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। (তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী ১/৩৭৩)

মাতার দিক থেকে বংশধারা : মুহাম্মাদ- আমেনা- ওহাব- আবদে মানাফ- যুহরা- কিলাব- মুর্‌রাযি...।

'কিলাব' পর্যন্ত গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা-মাতার বংশধারা মিলে যায়। অর্থাৎ পিতা এবং মাতা উভয় দিক থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইসমাঈল আ. এর বংশধর ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা-মাতা উভয়েই সর্বাধিক সম্মানিত খান্দান কুরাইশ বংশের। পিতা আব্দুল্লাহ ছিলেন বনু হাশেমের সর্দার, বরং সমগ্র আরবের সর্দার আব্দুল মুত্তালেবের সন্তান, আর মাতা ছিলেন বনু যুহরার সর্দার ওহাব এর কন্যা এবং নিজ গোত্রের সর্বাধিক সম্মানিতা নারী। (তাবাকাতে ইবনে সা'আদ; পৃষ্ঠা ২৬, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/২৭১)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লিখিত সম্পূর্ণ বংশধারা ছিল সব ধরনের অশ্লীল কর্ম থেকে পূত-পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ। আম্মাজান আয়েশা রাযি. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি বিবাহজাত সম্পর্কের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছি; ব্যভিচারজাত সম্পর্ক থেকে নয়। (তাবাকাতে ইবনে সা'আদ ১/২৬, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/২৮৫)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বংশধারা ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত এবং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এ শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক যবানেও উচ্চারিত হয়েছে, তেমনই তার বিরোধীরাও এ শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান মুহাম্মাদ। আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করলেন, তখন আমাকে সর্বোত্তম সৃষ্টি (মানুষ) বানালেন। এরপর তাদেরকে দু'টি দলে ভাগ করলেন (কাফের ও মুসলমান)। আমাকে তাদের মধ্যে উত্তমদের দলভুক্ত করলেন। অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে গোত্রে বিভক্ত করলেন। আমাকে তাদের মধ্যে উত্তম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করলেন। ... (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৭৮৮)

বুখারী শরীফের বর্ণনায় (হা.নং ৭) এসেছে যে, রোমের বাদশাহ কায়সার যখন আবূ সুফিয়ানকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন আবূ সুফিয়ান- যিনি তখনও ইসলাম করেননি-নবীজীর বংশের স্বীকৃতি দিয়ে বললেন-

هو فينا ذو نسب

অর্থ : তিনি আমাদের মধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশের অধিকারী!

'উত্তম গোত্র ও সম্ভ্রান্ত বংশ' ব্যাখ্যায় অন্য এক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল আ. এর বংশ থেকে কিনানাকে নির্বাচন করেছেন এবং কিনানা থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে হাশেমকে এবং বনু হাশেম থেকে আমাকে (নবুওয়াতের জন্য) নির্বাচন করেছেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২২৭৬)

কুরাইশ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বপুরুষদের মধ্য হতে কারো মতে 'ফিহ্‌র' আর কারো মতে নযর হলেন 'কুর‍াইশ'। ইবনে আব্দুল বার মালেকী রহ. প্রথম মতটিকে অর্থাৎ 'ফিহ্‌র' এর 'কুরাইশ' হওয়ার মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ফিহ্‌র এর অধস্তনদেরকেই কুরাইশ নামে আখ্যায়িত করা হয়। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/২১৯)

বনু হাশেম এবং আব্দুল মুত্তালিব

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ব পুরুষ ‘আবদে মানাফে’র সন্তান ‘হাশেমে’র পুত্রের নাম ছিল ‘শাইবা’। পিতার মৃত্যুর পর শাইবা যখন মাতৃকুল থেকে চাচা মুত্তালিবের সাথে মক্কায় চলে এলেন, তখন মক্কায় প্রবেশ করা মাত্র কুরাইশরা সম্বোধন করে বলল ‘হা-যা আব্দুল মুত্তালিব’ অর্থাৎ এই ব্যক্তি [শায়বা] মুত্তালিবের গোলাম! সে থেকেই শায়বা আব্দুল মুত্তালিব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। চাচার মৃত্যুর পর তিনি মক্কায় হাজীদের সেবক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন এবং সে সূত্রে মক্কার সর্বজনমান্য নেতৃত্ব ও সরদারীও লাভ করেন। নবীজীর পূর্বপুরুষ ‘কিনানা’ এর অধস্তনদের মধ্যে কুরাইশ ছিল সর্বাধিক সম্মানিত। কুরাইশদের মধ্যে হতে আবদে মানাফের পুত্র ‘হাশেম’ এর অধস্তন ছিল সবচেয়ে সম্মানিত। আমাদের নবীজীও এই বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন। (তাবাকাতে ইবনে সাআদ ১/৩৮)

আসহাবে ফীলের ঘটনা এবং কুরাইশের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ

মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বলেন, আসহাবে ফীলের এ ঘটনা ছিল আল্লাহর একটি নিদর্শন এবং এ কথার ভূমিকা যে, মক্কায় একজন নবী প্রেরণ করা হবে। যিনি কা'বাকে সকল মূর্তি ও প্রতিমা থেকে পবিত্র করবেন। আল্লাহর এ ঘরের হৃত সম্মান ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করবেন। সে নবীর দীনের সাথে এ ঘরের গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, সে নবীর আগমন নিকটবর্তী...! (আস-সীরাতুন্নববিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ১৩০)

ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনার যে বিবরণ উল্লেখ করেছেন, তার সারসংক্ষেপ এই– হাবশার বাদশাহ নাজাশী কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ামানের গভর্ণর আবরাহা বাদশাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে ইয়ামানের ‘সানআ’ এলাকায় ‘কুল্লাইস’ নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে। উদ্দেশ্য, যেন মক্কার কা'বার পরিবর্তে এ প্রাসাদের ইবাদাত করা হয়। কা'বার সম্মান হৃদয়ে ধারণকারী আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আরবরা এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এক কিনানী আরব উক্ত প্রাসাদে গিয়ে তা অপবিত্র করে এলো। ফলে আবরাহা ক্ষুব্ধ হয়ে কা'বা ধ্বংসের উদ্দেশ্য হস্তিবাহিনী নিয়ে আগমন করলো। মক্কার কুরাইশ সর্দার আব্দুল মুত্তালিব যখন দেখলেন যে, এ বিশাল বাহিনীকে প্রতিহত করার কোনো শক্তি তার নেই, তখন তিনি কা'বার দরজা ধরে ঘরের মালিকের কাছে ঘরের হিফাযতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর মক্কাবাসী আরবদের নিয়ে আল্লাহর আযাবের ভয়ে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। আল্লাহ তা'আলা সাগর থেকে একঝাঁক পাখি পাঠালেন যেগুলোর প্রত্যেকের মুখে এবং দু পায়ে মোট তিনটি করে পাথর ছিল। এ পাথরের বর্ষণেই আল্লাহ তা'আলা আবরাহার হস্তিবাহিনীকে ধ্বংস করে দেন। স্বয়ং আবরাহা আহত হতে হতে ইয়ামান পৌঁছে এবং সেখানেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়...! (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/১৮৬)

কুরাইশ নেতা আব্দুল মুত্তালিবের দু'আর বরকতে হস্তিবাহিনী পরাজিত হয়ে যাওয়ার পর মক্কার অন্যান্য আরব গোত্রের নিকট কুরাইশদের সম্মান অত্যধিক বেড়ে যায় এবং তারা কুরাইশকে ‘আহলুল্লাহ’ বা আল্লাহর প্রিয় বান্দা আখ্যায়িত করে। (সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৯১)

যমযম কূপ খনন এবং বনু হাশেমের শ্রেষ্ঠত্বের নতুন মাত্রা

হযরত ইসমাঈল আ. এর পরবর্তী সময়ে ইয়ামানের জুরহুম গোত্র মক্কায় আধিপত্য লাভ করে। কিন্তু পরবর্তী কোনো সময়ে বনী ইসমাঈল (ইসমাঈল আ. এর বংশধর) সহ অন্যন্য আরবরা তাদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করে। মক্কা ত্যাগ করার সময় জুরহুম গোত্র যমযম কূপটি মাটি চাপা দিয়ে যায়। কালের বিবর্তনে একসময় তার নাম-নিশানাও মুছে গিয়েছিল। ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে, নবীজীর দাদা কুরাইশ সর্দার আব্দুল মুত্তালিবকে একটি স্বপ্নের মাধ্যমে উক্ত কূপের স্থান দেখানো হয় এবং তাকে এ কূপ খনন করার নির্দেশ দেয়া হয়। আব্দুল মুত্তালিব তার পুত্র হারেসকে সঙ্গে নিয়ে এ কূপ খনন করতে গিয়ে প্রথমদিকে অন্যান্য কুরাইশদের পক্ষ হতে কিছুটা বাঁধার সম্মুখীনও হন। খনন হয়ে গেলে তিনি হাজীদেরকে তা থেকে পান করানো শুরু করেন। যমযম কূপ খনন এবং হাজীদেরকে তা পান করানোর মত সৌভাগ্য অর্জিত হওয়ায় কুরাইশের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে বনু হাশেমের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়।

আব্দুল মুত্তালিব মান্নত করেন যে, যদি আল্লাহ তাকে দশজন প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান দান করেন, তবে একপুত্রকে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করবেন। আল্লাহ তা'আলা দু'আ কবুল করলেন। মান্নত পূরণের সময় হলে লটারীতে সর্বাধিক প্রিয় ও কনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহর নাম উঠে এলো। কন্যাদের পরামর্শে আব্দুল মুত্তালিব দশটি উট– যা একটি মানুষের রক্তপণ ছিল- লিখে লটারী করলে আব্দুল্লাহর নামই আবার উঠে এলো। ক্রমেই দশটি করে উট বৃদ্ধি করা হলো, পরিশেষে ১০০টি উটে পৌঁছলে উটের নাম উঠে এলে আব্দুল মুত্তালিব আব্দুল্লাহর পরিবর্তে একশ উট কুরবানী করলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/২৬৬-২৭০)

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, উলূমুল হাদীস,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

مركز الدعوة والارشاد، داكا، بنغلاديش
মারকাযুদ্দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকঃ ইয়াকুব আহমাদ উসমানী, সাবেক শাইখুল হাদীস মাসনা মাদ্রাসা, যশোর।

নির্ভরযোগ্য যেকোন দারুল ইফতায়
ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রদের জন্য
ইফ্‌তা ও উসূলুল ফিকহে
ভর্তি কোর্স
কোর্স চলবে ২৫শে শাবান থেকে ২০শে রমজান পর্যন্ত
কোর্সে যা বিশেষভাবে থাকছে-
- হিদায়া ছালিছঃ ফাতহুল কদীর এর আলোকে জাদীদ মাসায়িলসহ
- নূ-রুল আন্ওয়ারঃ উসূলুল ফিকহের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের আলোকে
- উসূলুল ফিকহের উপর স্বতন্ত্র দরস

ঠিকানাঃ বাসা-২০, রোড-১, স্বপ্নধারা হাউজিং, বছিলা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

দারুল ইফ্‌তা
১ / ২ বছর মেয়াদী
ভর্তি চলবে ৭ থেকে ১০ শে শাওয়াল পর্যন্ত
ইফ্‌তায় যা বিশেষভাবে থাকছে-
- ফিকহুল মুয়ামালাত, ব্যাংক-বীমা
- শেয়ারবাজার, কোম্পানী
- অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সার্বিক যোগাযোগঃ
০১৭৫০-১৭১৩২০, ০১৯৭০-১৭১৩২০ মুদীর
০১৯৭০-১৭১৩২৫ মুন্তাজিম-
০১৯৭০-১৭১৩৩০ দপ্তর

মুহাম্মাদপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে কাছে

মুহিউস সুন্নাহ আল্লামা মাহমূদুল হাসান

মাওলানা নাঈম আবু বকর

নাম মাহমূদুল হাসান। পিতা গালীমুদ্দীন আহমাদ রহ.। মাতা ফাতিমা রমজানী। পৈতৃকনিবাস মোমেনশাহীর চরখরিচায়। জন্ম ৫ই জুলাই ১৯৫০ সন। হাফেযে কুরআন, দাওরায়ে হাদীস ও কামিল (মাস্টার্স– সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পাকিস্তান মাদরাসা বোর্ড) এবং মুফতী, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, আদীব ও ক্বারী। বর্তমানে তিনি বিশ্বের একজন শীর্ষ ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ইসলাহে উম্মতের মহান রাহবার, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ীসহ বহু মাদরাসার মুহতামিম ও পরিচালক, গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদের সম্মানিত খতীব। দীনের বিভিন্ন অঙ্গনে দীর্ঘ দিনের সাধনা, অবদান ও ভূমিকার জন্য দেশবাসীর নিকট বরেণ্য ও সমাদৃত। বিশেষ করে ধর্মীয় অঙ্গনের নানা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, জাতীয় পর্যায়ের ওলামা-মাশায়েখ ও বুযুর্গানে দীনের নিকট তিনি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। নতুন প্রজন্মের ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও তলাবাদের মাঝে তিনি সর্বজনমান্য ও প্রিয় ব্যক্তিত্বরূপে বিশেষভাবে বরিত। 'মুহিউসসুন্নাহ' উপাধি তাদের পক্ষ থেকে হযরতের কর্মনীতির বিনম্র মূল্যায়ন। হারদুঈর হযরতের 'রূহানী বসীরত ও ফারাসাত' তথা আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার ফলে তিনি আজ সমকালের নন্দিত পুরোধা। মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশের আমীর। আহলে হক ওলামা হাযারাতের বৃহত্তর দীনী ঐক্যের প্রতীক। মূলধারার আলেম সমাজ যে চিন্তা ও কর্মসাধনার অভিন্ন উত্তরাধিকারী সে হক ও হক্কানিয়াতের সমন্বিত অগ্রযাত্রার তিনি উদার ও সর্বজনগ্রাহ্য অগ্রপথিক।

বাংলাদেশের বাইরেও বিভিন্ন দীনী অঙ্গনে তার প্রতি আকর্ষণ ও প্রশংসনীয় অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে। পাশ্চাত্যে হযরতের প্রভাব ও পরিচিতি ছাড়াও উপমহাদেশের দেশগুলোতে দাওয়াতুল হকের সিলসিলায় তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। আরববিশ্বের বিজ্ঞ সমাজও তার ইলম, দাওয়াত ও ইসলাহী কার্যক্রমের প্রতি দিন দিন ঝুঁকছে। বাংলাদেশে গণমুখী দীনী দাওয়াতের বহুবিধ কর্মতৎপরতার পাশাপাশি তার সুন্নতী অনুশীলন, দরস-তাদরীস ও গবেষণাসমৃদ্ধ বই-পুস্তক আমরা অর্ধশতকাল ধরে পেয়ে আসছি। মসজিদ-মাদরাসা, ওয়াজ-মাহফিলে বা দেশ-বিদেশের সফরে তার জ্ঞানগর্ভ ও আধ্যাত্ম মর্মপূর্ণ বয়ান সমাজকে করছে নির্মল আলোকিত।

তার মতো একজন মহীরুহের মূল্যায়ন সহজ কাজ নয়। আকাবিরকে আল্লাহ তায়ালা এমন বহুমুখী গুণে ভরে রাখেন যে, পর্যবেক্ষণ যত বাড়ে, কামালাতের নতুন-সব দিগন্ত ততই খুলতে থাকে।

হযরত মুহিউসসুন্নাহ দা.বা. কে যারা কাছে থেকে দেখে তারা জানে, অন্যদের থেকে তিনি আলাদা। তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন কিছু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, যেগুলোতে সালাফের স্মৃতি ভেসে ওঠে। প্রত্যেক বুযুর্গের কিছু একান্ত বৈশিষ্ট্য থাকে, যা অহরহ অন্যদের মধ্যে দেখা যায় না। হযরত মুহিউসসুন্নাহ দা.বা. এর ব্যতিক্রমী কয়েকটি গুণবৈশিষ্ট্যের কথাই তুলে ধরতে চাচ্ছি।

১. ইহতিয়াত (দীনের ব্যাপারে সতর্কতা)

দীনী বিষয়ে ইহতিয়াত বা সতর্কতা একটি প্রশংসনীয় গুণ। হাদীস শরীফে সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে।

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك তিরমিযী শরীফের এই হাদীস বেশ প্রসিদ্ধ। সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীনের জীবনে ইহতিয়াতের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়।

হযরত মুহিউসসুন্নাহ দা.বা. এর মধ্যে ইহতিয়াতের গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, তিনি মাদরাসার যে কামরাটিতে থাকেন, মাসে মাসে তার ভাড়া মাদরাসার ফান্ডে জমা দেন। মাদরাসায় থাকাকালে সাধারণত তিনি ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় বাইরে থেকে আনানো খাবার খান। তবে প্রায়ই মেহমান থাকে বলে মাদরাসার বোর্ডিং থেকেও একটি খাবার জারি রেখেছেন। তার মূল্যও তিনি নিয়মিত পরিশোধ করেন।

সাধারণত মাদরাসাগুলোতে চুক্তিভিত্তিক বেতন-পদ্ধতি চালু থাকলেও হযরত দা.বা. মনে করেন, দীনী কাজের বেতন শ্রমভিত্তিক হওয়া উচিত। দীনী কাজের বিনিময় নেয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে যে মতভেদ রয়েছে তার আওতা থেকে বাঁচতেই মূলত এই সতর্কতা। তাই অন্যান্য মাদরাসার মতো তাঁর মাদরাসায় উস্তাদদের মাসিক ছুটির বরাদ্দ নেই। কেউ একদিন অনুপস্থিত থাকলেও বেতন কাটা যাবে। ওদিকে উস্তাদদের প্রয়োজন বিবেচনা করে তিনি বেতনে কিছু অতিরিক্ত অংক ধরে রেখেছেন, যাতে দুয়েকদিনের অনুপস্থিতির কর্তন ওই অতিরিক্ত থেকেই হয়ে যায়। এভাবে ইহতিয়াত ও উস্তাদদের প্রয়োজনের সুন্দর সমন্বয় করেছেন তিনি।

মাদরাসার জন্য অনুদান গ্রহণেও তিনি অত্যন্ত সতর্ক। যদি বুঝতে পারেন, কেউ প্রভাব-বিস্তার বা এমন কোনো দুরভিসন্ধি থেকে মাদরাসায় দান করতে চাচ্ছে কিংবা তার দান গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে কোনো জটিলতা হতে পারে, তাহলে ওই দান তিনি গ্রহণ করেন না। এজন্যই সরকারী এতীমফান্ড বা বিদেশি সংস্থার দান গ্রহণ করেন না তিনি।

শরঈ মাসাইলের ব্যাপারে তিনি আপসহীনতার প্রতিমূর্তি। ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলা নিয়ে নানা মত এবং ওলামায়ে কেরামের একাংশের এ নিয়ে শিথিলতা থাকলেও তিনি ছবির নিষিদ্ধতার ব্যাপারে অটল। সাংবাদিকের ছবি তোলার আশংকায় অনেক প্রয়োজনীয় সভা বা বৈঠকও তাঁর বর্জন করতে হয়। ছবির ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে তিনি বাংলা ও আরবী উভয় ভাষায় কিতাব লিখেছেন। ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়েও তিনি কঠোর। প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ব্যাপক জোয়ার সত্ত্বেও তিনি মনে করেন, শতভাগ ইসলামী শরীয়া তাতে অনুসৃত হয় না। তাঁর এই সাবধানী অবস্থানের সঙ্গে অন্যান্য মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন।

দাওয়াতুল হকের কাজে বা বিভিন্ন দীনী প্রোগ্রামে সারাদেশে হযরত দা.বা. এর সফর করতে হয়। আশ্চর্য হলেও সত্য, তিনি কোথাও বয়ান করে টাকা-পয়সা নেন না। এমনকি আয়োজকদের খাবারের দাওয়াতও কবুল করেন না।

২. গায়রত (দীনী বিষয়ে আত্মমর্যাদাবোধ)

দীনের ব্যাপারে গায়রত বা আত্মমর্যাদাবোধ ইসলামের দৃষ্টিতে

পছন্দনীয় একটি গুণ। মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, 'মুমিন আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন হয়।' (হাদীস নং ৭০৭১) হযরত দা.বা. এর মধ্যে গায়রতের যথেষ্ট উপস্থিতি দেখা যায়। সব কাজেই তিনি আলেম-সুলভ গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যাদাবোধ বজায় রাখেন। দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সমাজের নানাশ্রেণীর গণ্যমান্য মানুষ নিজেরাই ছুটে আসে। একান্ত প্রয়োজন বা হেকমত ছাড়া তিনি কারো বাসায় যান না।

হযরত দা.বা. যার-তার সঙ্গে বসে গল্পগুজব করেন না। যেখানে-সেখানে দাঁড়ান না। মাদরাসায় নিজের কামরা, মসজিদ ও দরসগাহ ছাড়া অন্য কোথাও তাঁকে দেখা যায় না। এক আশ্চর্য গাম্ভীর্য বা শ্রদ্ধাজাগানো ভাব চেহারায় ফুটে থাকে সবসময়। সবাই তাঁর কাছে যেতে সাহস পায় না।

৩. তায়াক্কুয (সচেতনতা ও দূরদর্শিতা)

বলা হয়ে থাকে, 'যে নিজের যুগ সম্পর্কে অবগত নয়, সে জাহেল।' সচেতনতা ও চিন্তাশীলতা ওলামায়ে কেরামের একটি অপরিহার্য গুণ। এই গুণটি হযরত দা.বা. এর মধ্যে এত অধিকমাত্রায় বিদ্যমান যে, তুলনা মেলা কঠিন। সমকালীন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তাঁর সুস্পষ্ট ও দূরদর্শী চিন্তাধারা রয়েছে। নানা মত ও পথের রাজনীতিকরা প্রায়ই তাঁর কাছে আসেন পরামর্শের জন্য। মুসলিম বিশ্বের ভালোমন্দ নিয়ে হযরত দা.বা. প্রচুর ভাবেন। ভাবেন দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও। 'বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়' শিরোনামে একটি বইও লিখেছেন ইতোমধ্যে।

নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তাঁর কাছে পরিষ্কার। ইলম, ওলামায়ে কেরাম ও তালিবে ইলমদের বিষয়ে সুস্পষ্ট চিন্তাধারা রয়েছে তাঁর। ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর নসীহত শুনলে একজন আলেমের হিম্মত অনেকখানি বেড়ে যায়। চোখে নতুন স্বপ্ন ভাসে। ছাত্ররাও তাঁর সুচিন্তিত উপদেশ শুনলে মুগ্ধ হয়। হযরত দা.বা. এর ফিকর অত্যন্ত উন্নত। হীনম্মন্যতা, হতাশাবোধ বা স্থবিরতা তাঁর মধ্যে নেই।

৪. শাগাফে ইলম (ইলমের প্রতি অনুরাগ)

শাগাফে ইলম বা ইলমী নিমগ্নতা আলেমের সবচেয়ে বড় শোভা। হযরত দা.বা. এর শাগাফে ইলম অতুলনীয়। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ইলম ও কিতাবের 'পোকা'। পাকিস্তানের নিউটাউনে পড়াকালে উস্তাদরা, বিশেষ করে খাস উস্তাদ আল্লামা ইউসুফ বানূরী রহ. তাঁর মুতালাআ তথা অধ্যয়নের ঝোঁক দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কত অসংখ্য কিতাব যে তিনি মুতালাআ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। শুধু মুতালাআই নয়, কিতাব-সংগ্রহেও তাঁর ঝোঁক রয়েছে সেই শুরুকাল থেকেই। নিজ টাকায় শত শত কিতাব কিনেছেন। যাত্রবাড়ী মাদরাসার উলূমুল হাদীস বিভাগ চালু হওয়ার সময় হযরতের নিজস্ব কিতাবগুলো ছিল মূল ভরসা। তাহলে বুঝুন, একজন ব্যক্তির কিতাবে চালু হয়েছে একটি উচ্চতর বিভাগ! বহু দুর্লভ ও প্রাচীন-ছাপা কিতাবের শুরুতে হযরতের স্বহস্তে লেখা নাম দেখে ছাত্ররা চমকে যায়।

এই বিস্তৃত অধ্যয়নের ফলে বহু দুর্লভ বিষয়বস্তু উদ্ধৃতিসহ তাঁর স্মৃতিতে জমা হয়ে আছে। তিনি যখন আলোচনার মাঝে মাঝে ওইসব উদ্ধৃতি দেন, দুষ্প্রাপ্য কোনো কিতাব থেকে যখন জরুরী বিষয় তুলে আনেন, শ্রোতারা বিস্মিত না হয়ে পারে না।

মুতালায়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ইলমী বিষয়ে নিজেও ভাবেন। নতুন কোনো তাওযীহ বা নুকতা উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। হাদীসের শরাহর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শারেহীনের কথার পর নতুন কিছু হতে পারে কি না- ভেবে দেখেন। এগুলো সবই তাঁর ইলমী শাগাফের অংশ। হযরতের উদ্ভাবিত নতুন তাওযীহাত সংকলিত হলে সবাই উপকৃত হবে।

ইলমী নিমগ্নতা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। ইলমের ক্ষতি হবে বিবেচনায় তিনি রাজনীতিতেও যোগদান করেন নি। নিজ মাদরাসায় দেননি কোনো সাংগঠনিক তৎপরতার অনুমতি। বহির্মুখী কর্মকাণ্ডে মাদরাসার সবকের ক্ষতি হবে- এটা তাঁর চরম অপছন্দ।

৫. পাবন্দিয়ে নেযাম (সময়ানুবর্তিতা)

হযরত দা.বা. শৃঙ্খলা অত্যন্ত পছন্দ করেন। রুটিনমতো কাজ করার অভ্যাস তাঁর মজ্জাগত। সময় নষ্ট করা তাঁর স্বভাবেই নেই। তাঁর কামরায় গেলে দেখা যায়, মুতালাআ, লেখালেখি বা কাউকে সাক্ষাৎদান- কিছু একটা অবশ্যই করছেন। এমনি বসে থাকতে বা অনর্থক কাজে সময় খরচ করতে তাঁকে কখনও দেখা যায় না।

রুটিনমতো প্রতিদিন প্রায় একই সময় তিনি মাদরাসায় আসেন। কোনো প্রোগ্রাম বা জরুরত না থাকলে বাদ এশা বাসায় ফেরেন। এই সারাদিনের নির্দিষ্ট রুটিন রয়েছে তাঁর। দরস, মুতালাআ, লেখালেখি, মাদরাসার পরিচালনা-সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন, সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাক্ষাৎ প্রদান, দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত পরামর্শকামনা-মূলক বা তরবিয়তী চিঠিপত্রের জবাব প্রদান ইত্যাদি কাজে তাঁর সময় কাটে। প্রত্যেক কাজের জন্য রয়েছে তার নির্ধারিত সময়।

মাদরাসার অন্যান্য কাজে নেযামের ব্যত্যয় দেখলেও তিনি নাখোশ হন। সবাইকে নেযামের প্রতি যত্নবান হতে আদেশ দেন। মাদরাসার মুহতামিম হিসেবে তিনি পারতেন, যখন খুশি মাদরাসায় আসতে, যখন খুশি যেতে বা ইচ্ছে হলে কোনোদিন সবক না পড়াতে। কিন্তু নেযাম যার স্বভাবগত, তিনি কি পারেন ক্ষমতার জোরে অনিয়ম করতে! তাঁর সুশৃঙ্খল ও সময়ানুবর্তী কাজ, নিয়মিত সবকপ্রদান, মাদরাসায় পূর্ণসময় বরং তার চেয়েও বেশি অবস্থান ইত্যাদি দেখে মনে হবে, যেন তিনি মুহতামিম নন, অন্য কারও অধীনে দায়িত্ব পালন করছেন!

৬। শওকে ইসলাহ (সংশোধনের-স্পৃহা)

আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের ক্ষেত্রে হযরত দা.বা. আপসহীন। উম্মতের ইসলাহের ফিকিরে তিনি পুরো জীবনই উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তাঁর তরবিয়তী কার্যক্রম মজলিসে দাওয়াতুল হকের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রসারিত হয়েছে। মানুষের উযু-নামায, আযান-ইকামত, সালাম-মুসাফাহা, কাফন-দাফন এসবের ইসলাহে তিনি অক্লান্ত মেহনত করে যাচ্ছেন।

তাঁর ইসলাহের আরেকটি বড় ময়দান তাযকিয়ার জগত। দেশ-বিদেশের হাজার-হাজার আলেম ও তালিবে ইলম তাঁর হাতে বাইয়াত অথবা তাঁর পরামর্শ মেনে চলেন। প্রতিদিন তাঁর বহু ইসলাহী চিঠির জবাব দিতে হয়। মুতাআল্লিকীনের প্রতি হযরত দা.বা. এর শফকত অতুলনীয়। তাঁর মূল্যবান দিক-নির্দেশনায় অনেকের জীবনের মোড় ঘুরেছে, অনেকের জীবন হয়েছে সার্থক। হযরত দা.বা. নিয়মিত ওলামা-তলাবার বিভিন্ন মজলিসে বয়ান করেন। এসব বয়ানে তাদের জন্য জরুরী হেদায়াত থাকে। এভাবে দেশের ইলমী জগতে তাঁর ইসলাহী কর্মকাণ্ডের বিরাট প্রভাব গড়ে উঠেছে। তিনি হয়ে উঠেছেন ওলামায়ে কেরামের অন্যতম প্রধান মুসলিহ।

হযরত দা.বা. এর তরবিয়তের ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকারী কর্মকর্তা ও শিল্পপতিরাও তার আওতাভুক্ত। গুলশানের জুমার বয়ানে তিনি এই শ্রেণীর ইসলাহের যথাসাধ্য প্রয়াস চালান। তাদের অনেকে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগও রাখেন। হযরতের বরকতময় সোহবতে অনেকেই ধীরে ধীরে দীনদার হয়ে যান।

আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের ক্ষেত্রে হযরত দা.বা. কারও পরোয়া করেন না। তিনি তখন টিকাটুলি জামে মসজিদের ইমাম। প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমল। একবার এরশাদ তাঁর মসজিদে যান। সঙ্গে ক্যামেরা হাতে সাংবাদিক। ছবির ব্যাপারে হযরত সবসময়ই কঠোর। শোনা যায়, ওই সাংবাদিক ছবি তুলতে নিবৃত্ত না হওয়ায় তিনি তার ক্যামেরা ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সামনে তাঁর এই সাহসী পদক্ষেপে সবাই হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তখনকার টিকাটুলির এক মুসল্লির মুখে শুনেছি, একবার এরশাদ সাহেব ওই মসজিদে মুসল্লীদের উদ্দেশে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। হযরত তাকে বললেন, 'কোন বিষয়ে বলতে চান? দুনিয়ার বিষয়ে না আখেরাতের? দুনিয়ার বিষয় হলে মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা জায়েয নেই।'

বিভিন্ন মাদরাসা বা ওয়াজ-মাহফিলে যখন তশরীফ রাখেন, সেখানে কোনো উসুলবিরোধী কাজ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তাম্বীহ করেন। ফলে তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের বেশ হুশিয়ার থাকতে হয়। হযরত দা.বা. এর অনেক কিংবদন্তিতুল্য সাহসী উচ্চারণ দীর্ঘদিন মানুষের মধ্যে জাগরূক থাকবে।

৭। কুওয়তে বয়ানঃ (বাগ্মিতা)

আল্লাহ তা'আলা হযরত দা.বা. কে এমন উপস্থাপনা-শক্তি দিয়েছেন যে, এককথায় বিস্ময়কর। তাঁর বয়ানের সম্মোহন অসাধারণ। সর্বশ্রেণীর মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা মুগ্ধ হয়ে তাঁর বয়ান শোনে এবং ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। আরও আশ্চর্য যে, বয়ানে তিনি ক্লান্ত হন না। একাধারে পাঁচ-ছয় ঘন্টা বয়ানের ঘটনাও তাঁর রয়েছে।

হযরত দা.বা. এর বাককৌশলের কথা সর্বজনবিদিত। তাঁর সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা দুষ্কর। ভ্রান্ত আকীদা বা ভুল মতবাদের লোকেরা তার সামনে লা-জওয়াব হয়ে যায়। এক নাস্তিক তাঁকে বলেছিল, 'চোখে না দেখে কোনো কিছু বিশ্বাস করি না। আল্লাহকে দেখা যায় না, তাই বিশ্বাস করি না।' হযরত তাকে বললেন, 'যার বাপের পরিচয় নেই, সেই একথা বলতে পারে।' লোকটি ক্ষেপে গেল। হযরত বললেন, 'শুনুন, আপনি যাকে বাবা বলেন, সে আপনার বাবা হওয়ার কী প্রমাণ আছে? এটা চোখে না দেখে বিশ্বাস করেন কিভাবে? আপনার মায়ের কথায় বাবাকে চেনা গেলে জীবনে একটি মিথ্যাও যিনি বলেননি, সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় আল্লাহকে চেনা যাবে না কেন?' লোকটি নিরুত্তর হয়ে গেল।

হযরত মুহিউসসুন্নাহ দা.বা. এর কথা অল্পতে বলে শেষ করার নয়। তাঁর অনেক উন্নত বৈশিষ্ট্যের এগুলো কিছু নমুনামাত্র। হযরতের আরও কিছু গুণবৈশিষ্ট্য- যেমন, ফাকাহাত, ফেরাসত, সবর ইত্যাদি নিয়েও অনেক কিছু লেখা যেতে পারে। আল্লাহপাক দীনের দূর্গসম এই মহান ব্যক্তির ছায়া আমাদের ওপর আরও বহুদিন প্রসারিত রাখুন! কালের এই প্রোজ্জ্বল পিদিমের জ্যোতির্ময় আলো আমাদের মাঝে দীর্ঘায়িত করুন। আমীন।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

(৪৪ পৃষ্ঠার পর; তালিবুল ইলম...)

তারা আমাকে মূল্যায়ন করবে, আমার কথা মানবে, পরবর্তীতে ফারেগ হওয়ার পর তাদের মধ্যে দীনী কাজ করা আমার জন্য সহজ হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নবুওয়াতের পূর্বেই সর্বজনমান্য ও সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছিলেন তার বহু কারণ থাকতে পারে। কিন্তু অন্যতম কারণ হল, তাঁর বদান্যতা ও অসহায়-দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়ানো। সহীহ বুখারীতে রয়েছে,

كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.

অর্থ : আল্লাহর কসম! কখনোই আপনাকে আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায়-দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩)

সুতরাং বন্ধু-বান্ধবদের এক কাপ করে চা পান করাই, চাচাকে সামান্য হাদিয়া দিই, ইমাম-মুআযযিন বা মাদরাসার উস্তাদদের একটু নাস্তা করাই, তাবলীগের সাথীদের একবেলা খানার ইন্তেযাম করি।

গ. ধর্মীয় দিক দিয়ে খিদমত

দীনের যে কথা আমি শিখেছি, কুরআন-সুন্নাহর যে বিষয় আমি আত্মস্থ করেছি সেটা আমার একক সম্পদ নয়। তাতে রয়েছে সকল মানুষের হক। অন্য দশজন থেকে আমার মাতা-পিতা, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজের মানুষের হক অনেক বেশি। সুতরাং আমাকে সেই হক আদায় করতে হবে।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. بلغوا عني ولو آية.

এগুলো তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে।

সুতরাং আমি ফজর নামাযের পর একেক দিন একেকজনকে সাথে নিয়ে হাঁটি এবং দীনী মুযাকারা করি, নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার সময় বড়দের আদবের সাথে ছোটদেরকে আদরের সাথে এবং সমবয়সীদেরকে তারগীবের সাথে মসজিদে নিয়ে যাই, নামাযের পর কয়েকজন সাথীকে নিয়ে বসি– একটি ঘটনা শুনাই, কারগুযারী শুনাই, দীনদারীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করি এবং আসরের পর তাদেরকে সাথে নিয়ে খুসূসী বা উমূমী গাশত করি। গ্রামের মসজিদ-মাদরাসায় সময় দিই, তাবলীগ-ওয়ালাদের সঙ্গ দিই।

কখনো এমন যেন না হয় যে, ছুটির শুরুতে বাড়ি গিয়ে কাঁথার ভিতরে ঢুকে পড়লাম আর ছুটি শেষ হলে সেখান থেকে বের হয়ে মাদরাসায় চলে এলাম। সমাজের মানুষ আমার কায়া দেখল না, আমার ছায়া তারা পেল না। এমন হলে ফারেগ হওয়ার পর আমাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে। সমাজের মানুষ আমাকে সঙ্গ দিবে না। আমার কথা শুনবে না, আমার পাশে কেউ দাঁড়াবে না।

মোটকথা, তালিবানে ইলমের চতুর্মুখী যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হলে মাদরাসা খোলা থাকতে যেমন পড়ালেখা করতে হবে, ছুটির সময়ও তেমন কিছু বিষয়ের মুতালাআ অব্যাহত রাখতে হবে। ইলমী যোগ্যতা যেমন অর্জন করতে হবে, কর্মদক্ষতা ও আচরণ দক্ষতার জন্যও মেহনত করতে হবে এবং আগামীতে ফারেগ হওয়ার পর বৃহৎ পরিসরে সফলভাবে দীনী খিদমত আঞ্জাম দানের লক্ষ্যে উপরোক্ত পদ্ধতিতে সমাজের সেবা করে যোগসূত্র তৈরি করতে হবে– নেটওয়ার্ক কায়েম করতে হবে। তাহলে আমি হতে পারবো অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ আলেম, দীনের সাচ্চা খাদেম, সর্বজন বিদিত দা'য়ী ইলাল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

সুন্নাহ-সম্মত পোশাক-৩

মুফতী শাব্বির আহমাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
(আট)
পোশাকের চারটি স্তর

ফরজ পর্যায় : পোশাকের প্রথম স্তর ফরয। এতে কোন ব্যত্যয় ঘটলে কবীরা গুনাহ হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল শরীরের আবশ্যকীয় গুপ্তাঙ্গ। শরীরে এ পরিমাণ অংশ অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে। একে শরীয়তের পরিভাষায় সতর বলা হয়। পুরুষের সতর হলো নাভী থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। এ অংশ সর্বদা আবৃত করে রাখা ফরয। স্ত্রী ছাড়া অন্য কাউকে তা দেখানো হারাম।

মহিলাদের সতরের চারটি স্তর রয়েছে। স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে সতরের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অন্যান্য মহিলাদের ক্ষেত্রে তার সতর হল নাভী থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। এ অংশ অন্যান্য মহিলাদের সামনেও আবৃত করে রাখতে হবে, কোন মহিলার সামনেও তা খোলা যাবে না। আর মাহরাম পুরুষ তথা পিতা, ভাই, আপন চাচা, মামা, ভাগিনা, শ্বশুর প্রমুখ যাদের সাথে কখনো বিবাহ জায়েয নয় এদের ক্ষেত্রে মহিলাদের সতর হল নাভী থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত এবং পেট ও পিঠ। এদের ক্ষেত্রে চুল, মাথা, হাত, বাহু, গলা, পায়ের নলা আবশ্যকীয় সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কোনরূপ কামভাব না থাকলে মাহরাম পুরুষ এ অঙ্গগুলো দেখতে পারবে। আর কামভাবের আশঙ্কা থাকলে এ অঙ্গগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া নাজায়েয। তবে কোন কোন আলেম মাহরাম পুরুষদের থেকেও সর্বদা এ অঙ্গগুলো ঢেকে রাখা জরুরী বলেছেন। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন ৬/৪০৩)

মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্যান্য সকল পুরুষ চাই সে কোনভাবে আত্মীয় হোক না হোক, তাদের থেকে মাথা, চুল, কান, গলা, বুক, পিঠ, পায়ের নলা ইত্যাদি পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখতে হবে। তাদের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য এই সকল অঙ্গই সতরের অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র শরঈ প্রয়োজনে মুখমণ্ডল, কবজি পর্যন্ত দু'হাত ও পায়ের পাতা খোলার সুযোগ আছে।

নাজায়েয পর্যায় : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল পোশাক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন সেগুলো সব এ পর্যায়ভুক্ত। এগুলো পরিধান করা নাজায়েয। নিষেধের গুরুত্ব বা মাত্রা হিসাবে তা মাকরূহ বা হারাম হবে। পুরুষদের জন্য রেশমী পোশাক, টাখনুর নিচে ঝুলন্ত পোশাক, অহঙ্কার বা প্রসিদ্ধির পোশাক, মেয়েলি পোশাক, লাল জাফরানী রঙের পোশাক, কোন অমুসলিম বা পাপে লিপ্ত ফাসেক সম্প্রদায়ের অনুকরণে তৈরী পোশাক, মেয়েদের জন্য পুরষালি পোশাক, আঁটসাঁট পোশাক, ফিনফিনে পাতলা পোশাক সবই এ পর্যায়ের।

জায়েয পর্যায় : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পোশাক পরিধান করেননি এবং তা কোন মূলনীতির আলোকেই নিষিদ্ধ বা মাকরূহ পোশাকের আওতায় পড়ে না, সে পোশাক ব্যবহার করা বৈধ বিবেচিত হবে। এটি পোশাকের জায়েয পর্যায়। মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই এরূপ পোশাক রয়েছে, যেগুলো কোন অমুসলিম বা পাপী সম্প্রদায়ের অনুকরণেও নয়, বা কোন নিষিদ্ধ পোশাকের আওতাভুক্তও নয়। পোশাকের ক্ষেত্রে বর্ণিত শরীয়তের মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়ার কারণে এ পোশাককে সুন্নাহ পরিপন্থী বলা যাবে না বরং এগুলো বৈধ পোশাক ও সুন্নাহ-স্বীকৃত পোশাক।

নফল বা মুস্তাহাব পর্যায় : যে সকল পোশাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিধান করেছেন এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন সেগুলো পরিধান করলে সওয়াব হবে এবং তা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হবে। তবে কেউ না পরলে গুনাহ হবে না। আর যে সকল পোশাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিধান করেছেন, কিন্তু পরতে উৎসাহ প্রদান করেননি, সেগুলোও যদি কোন মুসলিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণের উদ্দেশ্যে পরিধান করে তাহলেও সাওয়াব হবে। অবশ্য কেউ না করলে গুনাহ হবে না এবং না করলে আপত্তিও করা যাবে না।

মূলত এ ধরনের পোশাকই হুবহু বা সামান্য পরিবর্তনসহ আমাদের সমাজে সুন্নতী লেবাস হিসাবে পরিচিত। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রণিধানযোগ্য।

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন পোশাক কখনো কখনো পরিধান করে থাকলে তা সর্বদা পরিধানের উপর গুরুত্বারোপ করা সুন্নত বিরোধী কাজ। অনুরূপ কোন বিষয়ে কম গুরুত্ব দিলে সে বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়াও সুন্নাত বিরোধী কাজ। পদ্ধতি বা গুরুত্বগত ব্যতিক্রম বা বিরোধিতা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় ও গর্হিত।

২। এ ধরনের নফল পর্যায়ের অনুকরণ অনুসরণকে ফরজ, ওয়াজিব পর্যায়ের মত গুরুত্ব প্রদান করা এবং কেউ না করলে আপত্তি ও কটাক্ষ করা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ।

৩। এ ধরনের নফল পর্যায়ের অনুসরণ অনুকরণকে তাকওয়া পরহেজগারীর একমাত্র মাপকাঠি মনে করা আর অন্যান্য ফরজ-ওয়াজিব ও বান্দার হকের প্রতি উদাসীন থাকা চরম অন্যায়। আর এগুলোকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সীমারেখা নির্ধারণ করা এবং দলাদলি, কাদা ছোড়াছুড়ি অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিন্দনীয়।

৪। কোন জিনিস সুন্নত মোতাবেক না হলেই তা সুন্নাতের খেলাফ হবে এমনটি সবক্ষেত্রে নয় বরং এমনও হতে পারে যে, উক্ত জিনিসটি সুন্নাত নয় আবার সুন্নাহ বিরোধীও নয়। যেমন বর্তমান যামানায় আমরা বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করি। এ পাখা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেননি। যার ফলে এ পাখা ব্যবহারকে সুন্নাত বলা যাবে না। আবার খেলাফে সুন্নাত বা সুন্নাহ বিরোধীও বলা যাবে না। শরীয়তের আলোকে জায়েয পোশাক এ পর্যায়ভুক্ত। এসব পোশাককে খেলাফে সুন্নাহ বা সুন্নাহ পরিপন্থী বলা যাবে না।

(নয়)
বালাদেশে প্রচলিত কিছু পোশাকের শরঈ বিশ্লেষণ

ধুতি : আমাদের দেশে বর্তমানে ধুতি একান্তভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের পোশাক হিসেবে গণ্য। কেউ ধুতি পরলে প্রথম দৃষ্টিতেই বাংলাদেশের যে কোন মুসলিম বা হিন্দু তাকে হিন্দু বলে মনে করবেন। অতএব অমুসলিম সম্প্রদায়ের অনুকরণ হেতু ধুতি মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ পোশাক হিসাবে গণ্য হবে। মূলত পরিধান-পদ্ধতির কারণে ধুতি নিষিদ্ধ। তাই কেউ যদি ধুতিকে চাদরের মত বা লুঙ্গির পদ্ধতিতে ব্যবহার করে তাহলে তা নিষিদ্ধ হবে না।

হাফ প্যান্ট : যুবশ্রেণীর মাঝে হাফপ্যান্ট পরার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। হাফপ্যান্টে যেহেতু সতর আবৃত হয় না। হাঁটু এবং হাঁটুর উপরাংশ অনাবৃত থাকে তাই হাফপ্যান্ট পরিধান করে সতর অনাবৃত রাখা নাজায়েয বা কবীরা গুনাহ।

শার্ট-প্যান্ট : শার্ট-প্যান্ট মূলত অমুসলিম ইংরেজদের পোশাক; নেককার পরহেজগারদের পোশাক নয়। এজন্যই সমাজের সাধারণ মানুষ শার্ট-প্যান্ট পরিহিত ব্যক্তিকে মুত্তাকী পরহেজগার বলে মনে করে না। ইউরোপীয় উপনিবেশের পূর্বে ভারতবর্ষে শার্ট-প্যান্টের প্রচলন ছিল না। বর্তমানে আমাদের দেশে এর ব্যাপক প্রচলন ঘটে গেছে। এখন কেউ শার্ট-প্যান্ট পরিধান করলে তাকে কেউ ইংরেজ মনে করে না এবং ইংরেজদের মতো দেখা যাবে এই উদ্দেশ্যেও কেউ তা পরিধান করে না। সব ধর্মাবলম্বীরাই বর্তমানে তা পরিধান করে থাকে।

তাই প্যান্ট-শার্ট বর্তমানে নাজায়েয পোশাক থাকেনি। তবে নেককার পরহেজগারগণ এখনো তা পরিহার করে থাকেন। একজন মুসলিম স্বভাবতই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব পোশাক পরিধান করেছিলেন সেগুলো পছন্দ করবেন। তা না হলে নিজ দেশীয় বৈধ পোশাক পরিধান করবেন। ইউরোপিয়ান স্টাইল সে কেন গ্রহণ করবে? তাছাড়া বর্তমানে প্রায় সব প্যান্টই টাখনু আবৃতকারী। বলাবাহুল্য, পুরুষদের জন্য টাখনুর নীচ পর্যন্ত ঝুলানো সব পোশাকই নাজায়েয। অধিকন্তু যদি তা টাইটফিট হয়, হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত শারীরিক অবয়ব স্পষ্ট ফুটে উঠে তাহলে আরো কঠিন রকমের নাজায়েয। তবে যদি তা ঢিলেঢালা হয় এবং টাখনুর নীচ পর্যন্ত আবৃতকারী না হয় তাহলে তা নাজায়েয বিবেচিত হবে না। কেননা, تشبه বা কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাদৃশ্যের বিষয়টি বর্তমানে প্যান্ট-শার্টে বিদ্যমান নেই, যেমনটি রয়েছে ধুতিতে। তবে তা অনুত্তম বিবেচিত হবে। যে পোশাক পরিধান করলে প্রথম দৃষ্টিতেই মুসলিম বলে মনে হয়, সে পোশাকই পরিধান করা উচিত। অপরদিকে আলেম-উলামা বা দীনের দাঈ-ইসলাম প্রচারক এবং অনুরূপ ব্যক্তিবর্গের জন্য প্যান্ট-শার্ট আরো বেশি অপছন্দনীয়। অনেক জায়েয কাজও দীন প্রচারক, আলেমদের জন্য আপত্তিকর। কেননা, তারা পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রেও দীনের দাঈ।

টাই : বর্তমানে প্রচলিত ও ব্যবহৃত পুরুষদের পোশাকের একটি হল টাই। টাই সম্পূর্ণ ইউরোপীয় পোশাক। কোন কোন গবেষকদের মতে এটি খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীক। ইউরোপের খ্রিস্টানরা তাদের গলায় ক্রুশ ঝুলাত। ক্রমান্বয়ে এ ক্রুশই টাইয়ে রূপান্তরিত হয়। মুসলমানদের জন্য ক্রুশ ব্যবহার বা ক্রুশের ছবিযুক্ত পোশাক ব্যবহার নিষিদ্ধ। কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পোশাক বা ধর্মীয় স্মৃতিবিজড়িত পোশাক হারাম। এজন্য অধিকাংশ আলেমগণ টাই পরিধান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অবশ্য কোন কোন গবেষক আলেম ক্রুশচিহ্ন হতে টাইয়ে রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টি কোন বই-পুস্তকে খুঁজে পাননি বলে উল্লেখ করেছেন। তবে সমাজে একথাটির প্রসিদ্ধি রয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন, টাই সাধারণ ইউরোপিয়ান পোশাক, খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীক নয়। তবে মুমিনের উচিত সর্বাবস্থায় টাই পরিত্যাগ করা। কোন মুমিন অপ্রয়োজনীয় অথচ সন্দেহযুক্ত এবং বাহ্যত শিরকের প্রতীক ব্যবহার করতে পারে না। তাছাড়া টাই ব্যবহারে ফাসেকদের অনুকরণ ছাড়া পোশাকের অন্য কোন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নেই।

ছবিযুক্ত টি-শার্ট, গেঞ্জি : বর্তমানে ছবিযুক্ত টি-শার্ট, গেঞ্জির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। টি-শার্ট ও গেঞ্জিতে সাধারণত কোন খেলোয়াড়ের ছবি, কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীর ছবি, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর ছবি, কখনো আবার নটী-নর্তকীর অর্ধনগ্ন ছবিরও ছাপ দেয়া থাকে। পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, প্রাণীর ছবি সংবলিত পোশাক ব্যবহার নিষিদ্ধ। তাই প্রাণীর ছবি সংবলিত এ সব পোশাক পরিত্যাজ্য। এগুলো ব্যবহার করা যাবে না।

শাড়ী : বাংলাদেশের মহিলাদের প্রধান পোশাক শাড়ী। শাড়ী মূলত ভারতীয় পোশাক। বাংলাদেশের মুসলিম অমুসলিম প্রায় সকল মহিলা শাড়ী পরিধান করে থাকেন। স্বদেশীয় এ পোশাক ব্যবহার করা বৈধ। তবে শাড়ী ব্যবহার করলে সতর আবৃত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। মহিলাদের পেট, পিঠ মাহরাম পুরুষ আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও সর্বসম্মত সতরের অন্তর্ভুক্ত। বাবা, ভাই, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে কারো সামনেই পেট, পিঠ অনাবৃত থাকতে পারবে না। অনুরূপ মাহরাম নয় এমন আত্মীয়দের সামনে গলাও অনাবৃত রাখা যাবে না। তাই শাড়ী পরিধান করলে এ বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে কোমর পর্যন্ত ঝুল বিশিষ্ট এবং কলার বিশিষ্ট ব্লাউজ পরিধান করতে হবে।

(দশ)

পোশাক বিষয়ক কিছু আদব

পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হল ডান দিক থেকে পরিধান শুরু করা, আর খোলার ক্ষেত্রে বাম দিক থেকে খুলতে শুরু করা।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন,

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شانه كله.

অর্থ : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতা ব্যবহার করতে, মাথার চুল আঁচড়াতে, পবিত্রতা অর্জনে ও তাঁর সকল বিষয়ে ডান থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। (সহীহ বুখারী - ১/৭৪)

সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ হুরায়রা রাযি.বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصه بدأ بميامنه.

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন জামা পরিধান করতেন, তখন ডান দিক থেকে শুরু করতেন। (সুনানে তিরমিযী - ১/৩০৬)

পাজামা পরিধান করার ক্ষেত্রে বসে পরিধান করা আদব একথাও ফকীহগণ লিখেছেন। আর নতুন পোশাক পরিধানের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দু'আ পড়তেন।

সুনানে তিরমিযীর এক হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নতুন পোশাক পরিধান করলে তার নাম উল্লেখ করে বলতেন,

اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسئلك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনারই সকল প্রশংসা। আপনি আমাকে এই পোশাকটি পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং এর উৎপাদনের যত মঙ্গল ও কল্যাণ রয়েছে তা প্রার্থনা করছি। আর আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি এর অমঙ্গল থেকে এবং উৎপাদনের মধ্যে যত অমঙ্গল-অকল্যাণ রয়েছে তা থেকে। (সুনানে তিরমিযী ১/৩০৬)

অন্য এক হাদীসে নিম্নলিখিত দু'আটি বর্ণিত আছে,

الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي.

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে পোশাক পরিয়েছেন, যা দ্বারা আমি আমার দেহের গোপনাংশ আবৃত করছি এবং আমার জীবনকে সজ্জিত করছি। (মুসনাদে আহমাদ ১/১৫৮)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন। **(সমাপ্ত)**

লেখক : মুফতী ও মুহাদ্দিস, মাদরাসা বাইতুল উলূম ঢালকানগর, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।

قصص الانبياء

গ্রন্থ পরিচিতি

কাসাসুল আম্বিয়া : আল্লামা ইবনে কাসীর রহ.

মাওলানা আব্দুর রায্যাক যশোরী

সর্বময় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। হিদায়াত ও কল্যাণের মালিক কেবল তিনিই। তাঁর এ জ্ঞান প্রজ্ঞা মানবকুলে ছড়িয়ে দিতে, তাদেরকে হিদায়াত ও কল্যাণের পথে আহ্বান করতে পাঠিয়েছেন অগণিত নবী-রাসূল। যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে পবিত্র কুরআনে তিনি ২৫জন নবীর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কর্মধারা ও জীবনাদর্শের বিবরণ পেশ করেছেন।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জীবনাদর্শ মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যা অবলম্বনে আশরাফুল মাখলুকাত মানবজাতি তাদের জীবনকে স্বার্থক করে তুলতে পারে ও পরিণামে সফলতা লাভে ধন্য হতে পারে। তাই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জীবনীতে নিহিত আছে মানবমণ্ডলীর যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গলের উৎস।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের এই উজ্জ্বল ও আলোকময় জীবন উম্মতের মাঝে তুলে ধরতে তারীখ-তারাজীমের বিশাল বিশাল গ্রন্থসমূহের পাশাপাশি যুগে যুগে রচিত হয়েছে বহু ভাষায় বহু স্বতন্ত্র গ্রন্থ। সর্বপ্রথম এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (১১৪ হি.) এরপর আলী ইবনে হামযাহ কাসায়ী (১৮৯ হি.), সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তাসতরী (২৮৩ হি.), ইবনে যাব্বাব (৩২২হি.), মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল মালিক মুসবিহী (৪২০ হি.), আল্লামা সা'আলবী (৪২৭ হি.), আল্লামা রাবেন্দী (৫৬০হি.), ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি.) ও আল্লামা ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি.) রহ. প্রমুখ ইমামগণ। আমাদের আলোচনা এ বিষয়ে রচিত আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এর অনবদ্য গ্রন্থ কাসাসুল আম্বিয়া নিয়ে।

লেখক পরিচিতি

এই বিখ্যাত কিতাবের লেখক হলেন ৮ম শতকের অন্যতম ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ইতিহাসবিদ আল্লামা আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে উমর হারেস কাসীর রহ.; যিনি ইবনে কাসীর নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

লেখক রহ. ৭০১ হিজরীতে বসরার মুজদিল নামক স্থানে এক সম্ভ্রান্ত ও ইলমী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন সেখানকার বিশিষ্ট খতীব। বড় ভাই আব্দুল ওয়াহ্হাব ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম ও ফকীহ। জন্মের তিন বছর পর বাবা মারা গেলে বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। তিনি যেমন ছিলেন বিরল মেধা ও প্রতিভার অধিকারী তেমনই ছিলেন ইলমের জন্য জান-প্রাণ উৎসর্গকারী। উস্তাদ হিসেবে পেয়েছিলেন আল্লামা বুরহানুদ্দীন, কামালুদ্দীন, ইবনে তাইমিয়া, মিযযী ও যাহাবীর মত জগদ্বিখ্যাত আলেমগণকে। তাই অল্প সময়ে তিনি ফিকহ, হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাস শাস্ত্রে পূর্ণ বুৎপত্তি অর্জন করেন। ইতিহাস শাস্ত্রে আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, তাবাকাতুশ শাফিইয়্যা, কাসাসুল আম্বিয়া, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, হাদীস শাস্ত্রে শরহুল বুখারী, আল-আহকামুল কাবীর, আল-বায়িসুল হাসিস, তাফসীর শাস্ত্রে তাফসীরে ইবনে কাসীর তার অনন্য সৃষ্টি।

আল্লামা ইবনে হাবীব বলেন, তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাস শাস্ত্রের তিনিই সর্বশেষ নক্ষত্র।

আল্লামা আবুল মাহাসিন বলেন, তিনি ফিকহ, তাফসীর ও আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন এবং রিজাল ও ইলাল শাস্ত্রে ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

ইন্তিকাল

ইলমী ময়দানের মহান সিপাহসালার, উম্মাহর খেদমতে সর্বদা নিবেদিত প্রাণ এই মহান মনীষী ৭৭৪ হিজরীতে ৭৩ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে রব্বে কারীমের দরবারে মেহমান হন।

কাসাসুল আম্বিয়া : বিষয়-বিন্যাস

আরবী ভাষায় লিখিত এক ভলিয়মে সমাপ্ত ৭৭৩ পৃষ্ঠার এ মূল্যবান গ্রন্থটিতে লেখক রহ. কুরআনে বর্ণিত ২৫জন নবীর ২৪ জনেরই ঘটনা সুবিন্যস্তভাবে উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে যে সকল নেককার বান্দা-বান্দীদের ঘটনা কুরআনে কারীমে বিবৃত হয়েছে সেগুলোও সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। আর আখেরী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীর উপর স্বতন্ত্র কিতাব 'আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ' রচনা করায় এই কিতাবে তাঁর জীবনী আলোচনা করেননি। তবে উর্দূ ও বাংলার অনুবাদকগণ আখেরী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী তাতে যুক্ত করে দিয়েছেন।

নবীদের ঘটনাগুলো লেখক এ ধারায় সাজিয়েছেন-

হযরত আদম আ., ইদরীস আ., নূহ আ., হুদ আ., সালেহ আ., ইবরাহীম আ., লূত আ., শুআইব আ., ইসমাঈল আ., ইসহাক আ., ইয়াকুব আ., ইউসুফ আ., আইয়ূব আ., যুলকিফল আ., ইউনুস আ., মূসা আ., খাযির আ., ইলয়াস আ., হিযকীল আ., ইয়াসা'আ আ., ইউশা আ., শামবীল আ., দাউদ আ., সুলাইমান আ., শা'অইয়া আ., আরমিয়া আ., দানিয়াল আ., উযাইর আ., যাকারিয়া আ., ইয়াহইয়া আ., ঈসা ইবনে মারয়াম আ.।

বৈশিষ্ট্যাবলী

এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এতে কোন জাল ও বাতিল ইসরাঈলী বর্ণনা স্থান পায়নি। অতচ এ বিষয়ে রচিত প্রায় সব গ্রন্থই জাল ও বাতিল ইসরাঈলী বর্ণনায় ভরপুর।

লেখক এই গ্রন্থ রচনায় এক অনন্য পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তিনি প্রথমে কুরআন থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এরপর সহীহ হাদীস ও সালাফে সালেহীনের গ্রহণযোগ্য উক্তিসমূহের মাধ্যমে ঘটনা পূর্ণ করেছেন।

কুরআনে কারীমে ও হাদীসে নববীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্যভাণ্ডার এমন চমৎকার বিন্যাসে সংযুক্ত করেছেন যে, ঘটনার ধারাবাহিকতায় তা যেন তাসবীহ-দানার মতই একসূতোয় গাঁথা। সকল তথ্য-উপাত্ত অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে যাচাই বাছাই করে সন্নিবেশ করেছেন। পাশাপাশি যে সকল জাল ও ইসরাঈলী বর্ণনা ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সেগুলোরও উল্লেখপূর্বক পাঠককে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ঘটনা ছাড়া কুরআনে বর্ণিত আরো কিছু

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এতে বিশুদ্ধ তথ্যভিত্তিক সুন্দর ও সাবলীলভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। তাছাড়া এখন কেউ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য ও মানসম্পন্ন কাজ করতে গেলে বা বিশুদ্ধ কথা বলতে গেলে এ কিতাব থেকে বিমুখ হওয়ার কোন উপায় নেই।

ভাষান্তর

গ্রন্থটিকে আল্লাহ তা'আলা ঈর্ষণীয় মকবূলিয়ত দান করেছেন। উর্দূ, ফারসী, ইংরেজিসহ পৃথিবীর বহু ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এই মহামূল্য গ্রন্থটি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রকাশনী থেকে অনূদিত হয়েছে। উদাহরণত অনুবাদ করেছেন মাওলানা সাদ আবদুল্লাহ; আল-কাউসার প্রকাশনী। মাওলানা রফীকুল্লাহ; ইসলামী পাবলিকেশন্স। মাওলানা হেমায়েতুদ্দীন; ইসলাম পাবলিকেশন্স। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ। এছাড়া আরও অনেকে গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন। তবে আমাদের জানামতে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদটিই তুলনামূলক বেশি ভাল।

একটি সতর্কতা

এ মর্মে বিস্মিত হয়েছি সোলেমানিয়া বুক হাউসের দায়িত্বশীলদের প্রতি। তারা মাওলানা 'আবূ তাহের সুরাটী' রচিত উর্দূ কাসাসুল আম্বিয়া'–এর অনুবাদে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এর কাসাসুল আম্বিয়ার মলাট লাগিয়ে অনুবাদে মাওলানা উবায়দুর রহমান খান সাহেবের নাম দিয়ে বইটি বাজারে ছেড়েছেন। জানি না এতটা জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া তাদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব হল!!

বাজারে মাওলানা আবূ তাহের সুরাটী'র উর্দূ কাসাসুল আম্বিয়ার অনুবাদটিরই কাটতি বেশি বলে জানা গেছে। এর কারণ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে আমাদের মনে হয়েছে, এতে যেহেতু প্রচুর পরিমাণে চটকদার-চমৎকার, জাল-বানোয়াট ও ইসরাঈলী বর্ণনার সমাবেশ ঘটেছে তাই স্বভাবগতভাবেই সরলমনা মানুষ এদিকেই ঝুঁকে পড়েছে।

এটির ব্যাপক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য করে বহু প্রকাশনীই এটির অনুবাদ প্রকাশ করেছে। যেমন সোলেমানিয়া বুক হাউস, মীনা বুক হাউস, আলিফ পাবলিকেশন্স ও তাবলীগী কুতুবখানা ইত্যাদি।

এছাড়াও বাংলা ভাষায় বহু আলেম এ বিষয়ে স্বতন্ত্র সংকলন প্রস্তুত করেছেন। তন্মধ্যে মাওলানা কারামত আলী নিযামী, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম সিদ্দিকী, মাওলানা এ.কে.এম. ফয়জুর রহমান ও মাওলানা হেফজুর রহমান কর্তৃক সংকলিত কাসাসুল আম্বিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এগুলোর মধ্যে মাওলানা হেফজুর রহমান কর্তৃক সংকলিত কাসাসুল আম্বিয়াটি অনেক ভালো মনে হয়েছে। এতে তেমন কোন জাল ও ইসরাঈলী বর্ণনা নজরে পড়েনি। তাছাড়া তিনি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ঘটনাবলীর আলোকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর করণীয় কী তা-ও খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এর ভাষাও বেশ ঝরঝরে এবং সাবলীল।

মোটকথা, 'কাসাসুল আম্বিয়া' নামে বাজারে এখন বহু সংকলন এবং বহু অনূদিত গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে; যার সবগুলো এক নয় এবং এক মানেরও নয়। কাঁচা-পাকা সব যেন একাকার হয়ে গেছে। কাজেই সতর্কতামূলক আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. রচিত কাসাসুল আম্বিয়া'র আরবী সংস্করণ কিংবা এর নির্ভরযোগ্য অনুবাদ সংগ্রহ করাই অধিক নিরাপদ। আর অন্য কোনটি সংগ্রহ করতে চাইলে কোন বিজ্ঞ আলেমের সঙ্গে পরামর্শ করে নেয়া উচিত।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সহীহ রাহনুমায়ী করেন এবং কাসাসুল আম্বিয়া-তথা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জীবনী বার বার পাঠ করে নবীওয়ালা তরীকায় জীবন গঠনের তাওফীক দান করেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

লেখক : মুদার্‌রিস, আশরাফুল মাদারিস
সতীঘাটা, পান্তাপাড়া, সদর যশোর

(৩৪ পৃষ্ঠার পর; পুণ্যের মাসে পঙ্কিলতা)

চৌদ্দ. ঈদ মার্কেটিং : বেহায়াপনার নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা

'ঈদ অর্থ আনন্দ' কথাটি সবার মুখে মুখে। তবে কী সে আনন্দ? কী তার উপলক্ষ? কীভাবে উদযাপিত হবে সেই উৎসব– এ ব্যাপারে সকলেরই রয়েছে চরম উদাসীনতা ও ভ্রান্তি। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনাকারীদের কর্মে মুগ্ধ হয়ে ঈদগাহে মহান মালিকের পক্ষ হতে ক্ষমার ঘোষণা হয়,

ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات.

অর্থ : তোমরা ঘরে ফেরো নিষ্পাপ শিশু হয়ে। আমি তোমাদের পাপসমূহ পুণ্যে পরিণত করে দিয়েছি।

এই গায়েবী সুসংবাদই আনন্দের মূল কারণ। তাই নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত করে দিয়েছেন, তোমাদের যে পোশাক আছে তার মধ্য হতে উত্তমটি পরিধান করে তোমরা পুরস্কার নিতে ঈদগাহে যাও। নতুন পোশাক ঈদের কোন সুন্নাত নয়। কিন্তু আজ রোযা-নামায, পর্দা-পুশিদা সব জলাঞ্জলী দিয়ে এ মার্কেট থেকে সে মার্কেটে নারী-পুরুষ একাকার হয়ে যেভাবে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে, এতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কেমন পুরস্কারের আশা করা যায়? এবারের ঈদে কে কত দামী পোশাক নিয়েছে, কে কত টাকার শপিং করেছে– এসব বেহায়াপনার নির্লজ্জ মহড়া বৈ কিছুই নয়। কেনাকাটা হবে প্রয়োজন মাফিক; ঈদ কেন্দ্রিক নয়। যার যা প্রয়োজন তা রমাযান আসার আগেই সেরে ফেলতে হবে, যেন রোযা-তারাবীহতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। রমাযানের বরকতময় সময়গুলো তো মার্কেটে মার্কেটে টহল দিয়ে নষ্ট করার জন্য নয়!

পনেরো. চাঁদ রাত : শয়তান শৃঙ্খলমুক্ত; তাই এত উন্মাদনা

হাদীস শরীফে এসেছে,

من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

অর্থ : যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাত সওয়াবের আশায় ইবাদতে কাটাবে, কঠিন হাশরে যখন সব অন্তর মরে যাবে সেদিনও তার হৃদয় সজীব থাকবে। (তাবারানী)

শবে কদর, শবে বরাতের ন্যায় ঈদের রাতও অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। কিন্তু শয়তান সবেমাত্র মুক্তি পেয়ে কিছু মানুষের কাঁধে এমনভাবে জেঁকে বসে যেন এটা ফুর্তির রাত। নাচ-গান, আতশবাজি, বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে আড্ডা এমনকি মদ্যপান দেখে মনে হয় যেন থার্টিফার্স্ট নাইট উদযাপন। নাউযুবিল্লাহ। এই পবিত্র রাতে এসব বেলেল্লাপনা পরিহার করে পরের দিন সকালে ঈদগাহে রোযার প্রতিদান যেন ভালো হয় সেজন্য নফল ইবাদত, দু'আ, ইস্তিগফার, কান্নাকাটি বেশি বেশি করা দরকার।

ষোল. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি

মাহে রমাযানে রোযাদারের সাহরী ইফতারের কাজে সহায়তা করা, সুলভ মূল্যে প্রয়োজনীয় আসবাব সরবরাহ করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব, অনেক সওয়াবের কাজ। কিন্তু রমাযান আসার আগে থেকেই কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে থাকে। সবকিছু সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। স্বল্প আয়ের মানুষের নাভিশ্বাস ওঠে। তাই অন্তত এ মাসে ব্যবসায়ী মানসিকতা পরিহার করা আবশ্যক। সবার মাঝে খিদমতের স্পৃহা থাকা উচিত। রমাযান মাসে হালালভাবে ব্যবসা করলে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করেন। আর এভাবে গলায় ছুরি ঠেকিয়ে আয় যতই হোক তাতে কোন বরকত থাকে না।

আল্লাহ তা'আলা সকলকে মাহে রমাযানের পূর্ণ খায়ের ও বরকত নসীব করুন। সব ধরনের রসম-রেওয়াজ থেকে দূরে রেখে খালেসভাবে বেশি বেশি নেক আমলের তাওফীক দান করুন। আমীন

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া
আরাবিয়া, ঢাকা

রসম রেওয়াজ

রমাযানুল মুবারক : পুণ্যের মাসে পঙ্কিলতা

মাওলানা শফীক সালমান কাশিয়ানী

মাহে রমাযান। রহমতের মাস। তাকওয়া অর্জনের মাস। হাদীসে নববীর ভাষ্য অনুযায়ী এ মাসে শয়তান শেকলাবদ্ধ থাকে। জাহান্নামের দরজাসমূহ রুদ্ধ হয়ে যায়। যমীনে অবিরাম বর্ষিত হয় রহমতের বারিধারা। ফলে প্রতিটি মুমিনের হৃদয়ভূমি থাকে উর্বর। আখেরাতের ফসল ঘরে তোলার আশায় সেই উর্বর ভূমিতে নেক আমলের উন্নত বীজ বপন করতে শ্রেণী-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমান হয়ে ওঠে উদগ্রীব। সকলের মনে প্রবল আগ্রহ জাগে বেশি বেশি নেক আমলের। কেননা মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে এই মাসে রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও নাজাতের ঘোষণা রয়েছে। পাশাপাশি হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইরশাদ করেছেন, মাহে রমাযানে ফরয আমলের সওয়াব কমপক্ষে সত্তরগুণ বৃদ্ধি করা হয় আর নফলগুলো ফরযতুল্য হয়ে যায়।

অপরদিকে সৃষ্টিগতভাবে মানুষ আনুষ্ঠানিকতা প্রিয়। যে কোন বিষয়ে লোক সমাগম করা এবং ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রদর্শনীর মানসিকতা সাধারণ মুসলমানের মাঝে দিন দিন উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে যে পবিত্র ও বরকতময় মাসের প্রতিটি মুহূর্ত আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের অনন্য সুযোগ, সেই মুবারক মাসেও ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে মানুষ এমন সব লৌকিকতা, আনুষ্ঠানিকতা ও পাপাচারের আশ্রয় নিয়ে থাকে যা তার নেক আমলকে সমূলে বরবাদ করে দেয়। বৃথা যায় তার সকল মুজাহাদা ও মেহনত।

মানুষ সারাটা দিন রোযা রেখে ইফতার মুহূর্তে অথবা রোযার শুরুতে সাহরীতে কিংবা গোটা মাস সিয়াম সাধনা করে ঈদের দিনে ফসল তোলার আগমুহূর্তে এমন সব অধর্ম-অপসংস্কৃতির চর্চায় লিপ্ত হয়, যার ফলে তার সমস্ত নেক আমল জ্বলে-পুড়ে নিমিষেই ভস্ম হয়ে যায়। পবিত্র মাহে রমাযানে প্রচলিত এ ধরনের অবশ্য-বর্জনীয় কিছু রসম-রেওয়াজ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হচ্ছে, যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এগুলো পরিহার করে যথাযোগ্য মর্যাদায় মাহে রমাযান যাপন করার তাওফীক দান করেন।

এক. খতম তারাবীহর বিজ্ঞাপন : হাফেয আবশ্যক

গেটে গেটে, দেয়ালে দেয়ালে 'তারাবীহর হাফেয আবশ্যক' জাতীয় পোস্টার সাঁটিয়ে নির্ধারিত দিনে শত শত হাফেযকে প্রহসনমূলকভাবে জড়ো করা হয়। কয়েক দিন ব্যাপী চলে ধুন্ধুমার ইন্টারভিউ। অবশেষে জানা যায়, অমুক সাহেবের অমুক আত্মীয়কে তারাবীর হাফেয হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। 'মাথার মুকুট' হুফফাযে কেরামকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করার এটা এক পীড়াদায়ক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে হাফেয নির্বাচন করা হলে হাফেযদেরকে 'প্রার্থীদের কাতারে' দাঁড় করিয়ে অপমান করা হয়। এছাড়া সব হাফেযকে ডেকে এনে দু-একজনকে বেছে রেখে বাকীদেরকে 'অযোগ্য' হিসেবে বিদায় করার অবমাননা তো আছেই।

সঠিক পদ্ধতি হল, মসজিদ কর্তৃপক্ষ পার্শ্ববর্তী কোন মাদরাসায় নিজেরা উপস্থিত হয়ে পছন্দ করে হাফেয নিয়ে আসবেন। অথবা ইমাম সাহেব বা কোন আলেম মারফত ভালো মানের দু-চার জনকে আসতে বলবেন। তাদের তিলাওয়াত শুনে এক দু'জনকে রেখে দিবেন। এক্ষেত্রে মূল লক্ষণীয় হল, হাফেয সাহেবের ইয়াদ ঠিক আছে কিনা এবং তার চোহারা-সূরত, আমল-আখলাক সুন্নাত মোতাবেক কিনা সেটা যাচাই করা। অনেকে সুমধুর কণ্ঠের শর্ত জুড়ে দেন। কণ্ঠ তো মানুষের ইচ্ছাধীন নেয়ামত নয়; এটা আল্লাহর দান। এজন্য এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা কাম্য নয়। মোটামুটি শ্রুতিমধুর হলেই যথেষ্ট। সহজভাবে হাফেয সাহেবদের তারাবীহর ব্যবস্থা করে দেয়া সকলের দীনী কর্তব্য।

দুই. হাফেযদের সাথে চুক্তি করা

অনেক স্থানে স্পষ্টভাবে বা অঘোষিতভাবে চুক্তি হয়ে থাকে। এগুলো যারপরনাই নিন্দনীয় এবং হারাম কাজ। এ ধরনের লেন-দেন থেকে বেঁচে থাকা হাফেয সাহেব ও মসজিদ কর্তৃপক্ষ সকলের জন্যই জরুরী। হাফেয সাহেব খালেস নিয়তে তারাবীহ পড়াবেন। আর কর্তৃপক্ষ বদান্যতার সাথে তাদের থাকা-খাওয়া, যাতায়াত খরচ ইত্যাদির সুব্যবস্থা করবেন। যদি বিনিময় ছাড়া তারাবীহ পড়ানোর লোক পাওয়া না যায় তাহলে যে সকল প্রতিষ্ঠান হতে বিনিময় বিহীন হাফেয পাঠানো হয় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। অন্যথায় সূরা তারাবীহর ব্যবস্থা করবেন।

তিন. অপূর্ণাঙ্গ তারাবীহ পড়া

অনেকে লম্বা সময়ের অজুহাতে দু-চার দিন খতম তারাবীহ পড়ে তারপর তারাবীহকে ছুটি দিয়ে দেন। অনেক ব্যবসায়ী ভাইয়েরা প্রথম দশ দিনে খতম করে পরের দিনগুলোতে আর তারাবীহ পড়েন না। এ জাতীয় লোকদের জন্য পরবর্তী দিনগুলোতে সূরা তারাবীহর ব্যবস্থা রাখা জরুরী। বর্তমানে অনেকে আবার তাহাজ্জুদ সংক্রান্ত একটি হাদীসে কতিপয় অজ্ঞ লোকের অপব্যাখ্যার শিকার হয়ে আট রাকাআত পড়েই মসজিদ থেকে দৌড় দেন। নিঃসন্দেহে তারা স্থায়ীভাবে পূর্ণাঙ্গ তারাবীহর সওয়াব হতে বঞ্চিত থাকছেন। মাহে রমাযানের যথাযথ খায়ের-বরকত লাভ করতে হলে পূর্ণ ৩০ দিন ২০ রাকাআত করেই তারাবীহ পড়তে হবে। খতম সম্ভব না হলে অন্তত সূরা তারাবীহ পড়তে হবে।

চার. ইফতার পার্টি : মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষের অবাধ সম্মিলন

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

অর্থ : তোমাদের জন্য রোযার বিধান রাখা হয়েছে যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (সূরা বাকারা- ১৮৩)

তাই মাহে রমাযানের মূল প্রতিপাদ্যই হচ্ছে গুনাহমুক্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে খোদাভীতি অর্জন করা। অপরদিকে কোন রোযাদারকে এক টুকরো খেজুর দিয়ে ইফতার করালে রোযাদারের সমপরিমাণ নেকী লাভ হয়। এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ নফল ইবাদত বটে; কিন্তু তা লৌকিকতা ও পঙ্কিলতাপূর্ণ হলে এমন হাজারো নফল আমলেও কখনো এক চুল নেকী অর্জিত হয় না। বরং এমন আমল ধ্বংস ও ক্ষতিই ডেকে আনে কেবল।

পরনারীর সঙ্গে পর্দা করা ইসলামী শরীয়তের একটি অলঙ্ঘ্য ফরয বিধান। তাই নফল ইফতারের জন্য নারী-পুরুষ একাকার হয়ে পর্দার ফরয বিধান লঙ্ঘন করা অত্মঘাতী কাজ। বর্তমানে রমাযান

এলে দেখা যায় রাজনীতির মঞ্চ পেরিয়ে পাড়া-মহল্লায়ও ইফতার পার্টির ধুম পড়ে। কী অদ্ভুত শব্দ চয়ন! পার্টি শব্দটি সাধারণত অশ্লীলতা-নগ্নতাপূর্ণ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সমাজে ব্যান্ড পার্টি, যাত্রা পার্টি, ডিজে পার্টি, পার্টি সেন্টার এসকল স্থানে নারী-পুরুষের অবাধ সম্মিলনসহ আরো কত কী হয় তা কারো অজানা নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়! ইফতার-সাহরীর ন্যায় মহিমান্বিত ইবাদতেও এই নগ্ন 'পার্টি'র আয়োজন করা হচ্ছে।

এছাড়া রোযার মূল শিক্ষা হচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ আর পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকা। অথচ রাজনৈতিক দলগুলোর কথিত ইফতার পার্টির প্রধান বক্তব্যই হচ্ছে বিরোধী দলের কুৎসা রটানো আর মিথ্যার বেসাতি ছড়ানো। নেতা-নেত্রী পাশাপাশি বসে এমনকি বিধর্মীদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইফতারের নামে মহাভোজ দেখে মনে হয় এটা যেন আখেরাত বরবাদীর মহোৎসব।

হিন্দুদের ইফতার পার্টি : ইদানিং হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও ধর্মনিরপেক্ষতার নিদর্শনস্বরূপ ইফতার পার্টির আয়োজন করে। এরকম সুদ–ঘুষ, হালাল-হারামের বাছ-বিচারবিহীন ইফতারের আয়োজনে শরীক হওয়া কোন মুমিনের শান নয়। এসব পার্টিগুলোতে থাকে বেহায়াপনার ছড়াছড়ি, অপচয়, অপব্যয়, আড্ডাবাজি ইত্যাদি। কোন কোন রেস্টুরেন্টে আনলিমিটেড খাবারের প্যাকেজ ছাড়া হয়। এক ঘণ্টায় পাঁচশ টাকা। পিৎজা, কেক নির্ধারিত আইটেম যে যত খেতে পারে খায়। ভোজনবিলাসীরা দল বেঁধে ছুটে আসে এসব স্থানে মুখরোচক রসনায় ভুরিভোজ করতে! এই ভোগমত্ততায় একদিকে যেমন পবিত্র রমাযানের সংযম-সাধনাকে অবজ্ঞা করা হয় অপরদিকে মাগরিব, ইশা ও তারাবীহর ব্যাপারে চরম উন্নাসিকতা প্রদর্শিত হয়।

তাই আর নয় ইফতার পার্টি। প্রয়োজনে ইফতার মাহফিল করা যেতে পারে। সামর্থবান সকলেরই উচিত রোযাদারকে ইফতার করানো। সেটা নিজ গৃহে শরীয়তের সকল বিধান পালন করে কিংবা নিকটস্থ কোন মসজিদ বা মাদরাসার দীনী পরিবেশে।

পাঁচ. সাহরী পার্টি : উন্মাদনার আরেক ইস্যু

ইদানিং সাহরী পার্টিরও আয়োজন দেখা যাচ্ছে। বাসা-বাড়িতে ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে হোটেলে গিয়ে সাহরী খাওয়া তামাশা বৈ কিছুই নয়। একাজে আবাসিক হলগুলোর ছাত্র-ছাত্রী এবং বখাটে টাইপের লোকজন বেশি অগ্রগামী। গত কয়েক বছর ফুটবল বিশ্বকাপ চলেছে রমাযান মাসে। এরা শেষ রাত পর্যন্ত খেলা দেখে চলে যায় পার্টি সেন্টারে সাহরী খেতে। সাহরী খায় ঠিক কিন্তু দিনের বেলায় এদের অধিকাংশই রোযা রাখে না।

মনে রাখতে হবে, সাহরী গ্রহণ করাও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত। এটাও হতে হবে নববী তরীকায় সম্পূর্ণ লৌকিকতাহীন ও গুনাহমুক্ত পরিবেশে।

ছয়. দিনে হোটেল রেস্তোরা খোলা রাখা : প্রকাশ্যে পানাহার

যদি কেউ কোন কারণ বশত রোযা রাখতে না পারে, তাহলে অন্য রোযাদারের সামনে তাকে পানাহার করতে বারণ করা হয়েছে। এমনকি মুসলিমপ্রধান দেশে বসবাসকারী বিধর্মীদেরকেও রমাযানের পবিত্রতা রক্ষার্থে গোপনে পানাহার করতে বলা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অনেক মুসলমান অকারণে রোযা না রেখে প্রকাশ্যে হোটেল-রেস্টুরেন্টে খাবার গ্রহণ করে। প্রত্যেক মুসলিম হোটেল মালিকের জন্য ওয়াজিব তাদের হোটেলে দিনের খাবারের ব্যবস্থা না রাখা। শুধুমাত্র ইফতার সামগ্রী ও রাতের খাবারের ব্যবস্থা রাখা। অন্যথায় উভয়পক্ষ মারাত্মক গুনাহগার হবেন।

আগেকার দিনে হোটেল মালিকরা নিজেদেরকে অপরাধী মনে করে চাদর টাঙিয়ে দোকান ঢেকে রাখত। কিন্তু বর্তমানে এসব রাখঢাকের কোন বালাই নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

অর্থ : তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করো। গুনাহ ও বিদ্বেষের কাজে কেউ কাউকে সহযোগিতা করো না। (সূরা মায়িদা- ২)

সাত. ধর্মীয় প্রোগ্রামের নামে রেডিও-টেলিভিশন প্রীতি

অনেকে সওয়াবের কাজ মনে করে রেডিও-টিভির তিলাওয়াত শোনে। সরাসরি মুখের তিলাওয়াত না শুনলে কোন সওয়াব হয় না। কেউ আবার ধর্মীয় আলোচনা শোনার জন্য দীর্ঘ সময় রেডিও, টিভি নিয়ে পড়ে থাকে। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে প্রদর্শিত হয় গান-বাদ্যসহ বিজ্ঞাপন। টিভির পর্দায় আলোচক মৌলবী সাহেবকে পিছে রেখে বিজ্ঞাপন নিয়ে হাযির হয় বেপর্দা, অর্ধনগ্ন যুবতীরা। তাছাড়া ভিডিও ধারণ করে ধর্মীয় প্রোগ্রাম করাও হারাম কাজ। সুতরাং তা দেখাও হারাম।

মাহে রমাযানের প্রতি সেকেন্ড সময়কে গনীমত মনে করে দু'আ, ইস্তিগফার, তিলাওয়াত, তাসবীহতে মশগুল থাকা দরকার। কিন্তু ইয়াহুদীচক্র মুসলমানদেরকে বঞ্চিত করার জন্য নেক আমল থেকে দূরে রেখে চিরাচরিত বদাভ্যাস অভিশপ্ত টিভির সামনে বসিয়ে রাখে। এ মর্মে আমাদের আরও সচেতন হওয়া উচিত। চরিত্র বিধ্বংসী শয়তানের এই বাক্সকে ঘর থেকে ছুড়ে ফেলার হিম্মত না হলেও অন্তত রমাযানের খাতিরে তা তালাবদ্ধ করে রাখা উচিত। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে হিম্মত দান করুন।

আট. ফজরের আযানের অপেক্ষায় সাহরী খেতে বিলম্ব

অনেকে মনে করেন, আযান হওয়া পর্যন্ত সাহরী খাওয়া যায়। তাই তারা আযান দেয়া পর্যন্ত খেতে থাকেন। এতে উক্ত রোযা সমূলে নষ্ট হয়ে যায়। নিশ্চিতভাবে তাদের রোযা কাযা করতে হবে। কারণ রোযার সকল স্থায়ী সময়সূচীতে সতর্কতামূলক সাহরীর সময় শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট পরে আযান দিতে বলা হয়েছে। সুতরাং মসজিদগুলোতে যখন আযান দেয়া হয় তার অন্তত তিন-চার মিনিট আগেই সাহরীর সময় শেষ হয়ে গিয়ে থাকে। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সাহরী খাওয়া শেষ করতে হবে। গ্রামাঞ্চলের কোন কোন মুআযযিন সাহেব সাহরীর সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আযান দিয়ে দেন। এটাও একটা মারাত্মক ভুল। কারণ তখনো ফজরের সময় শুরু না হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক আযান অসময়ে হয়ে যায়।

নয়. 'সাতাশের রাত' উদযাপন

মহান আল্লাহ পাক মহিমান্বিত শবে কদরকে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম বলে অভিহিত করেছেন। তবে এর দিনক্ষণ গোপন রেখেছেন বিশেষ কোন হিকমতে। বছরের যে কোন সময় 'শবে কদর' হতে পারে। তবে রমাযান মাসে হওয়াটা প্রায় নিশ্চিত। শেষ দশকে, অতঃপর বেজোড় রজনীগুলোতে কদরের রাত অন্বেষণ করতে বলেছেন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হযরত আবূ যর রাযি. বলেন, আমি আরো একটু বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন বেজোড় তারিখে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আমার প্রতি ভীষণ রেগে গেলেন। আগে-পরে কখনো তিনি এত গোস্বা হননি।

হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেইশ তারিখেও শবে কদরের বন্দেগী করেছেন। আবার সাতাশ তারিখেও বহুবার ইবাদত করেছেন। এতে বোঝা যায়, প্রতি বছর শবে কদর একই তারিখে থাকে না। তবে সাতাশ তারিখে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই বলে শুধু ঐ এক রজনীই উদযাপন করে নিশ্চিন্তে বসে থাকা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, বঞ্চিত হওয়ার কারণ।

স্বাভাবিকভাবে সবাই সাতাশের রাতকে শবে কদর মনে করে এ রাতে তারাবীহর খতম করে থাকেন। প্রতি বছর এভাবে করা ঠিক নয়। কোন কোন বছর দুই/এক দিন আগে পরে খতম করা আবশ্যক। অন্যথায় একপর্যায়ে এটাকে আবশ্যক মনে করা হবে; যা বিদআতে পরিণত হয়ে যেতে পারে।

আতশবাজি, আলোকসজ্জা, মীলাদ-শিরনি ইত্যাদির মাধ্যমে এ রাতের গাম্ভীর্য, নীরবতা ভঙ্গ করে বাজারের পরিবেশ সৃষ্টি করা কিছু লোকের অপরিহার্য কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। এ রাতকে ঘিরে ব্যবসায়ীদের চাঞ্চল্য বেড়ে যায়। পীরের মাযার, আত্মীয়-স্বজনের কবর যিয়ারতের হিড়িক পড়ে যায়। গাছতলায় রেডিমেড খতম কেনা-বেচা হয়। টাকা অনুযায়ী খতমের শ্রেণী বিন্যাস থাকে– ১০০ টাকার খতম নিবেন, নাকি ৫০০ টাকার! রুমালের গিট খুলে খতম বখশে দেয়া হয়। টাকা কম দিলে আবার খতম ফিরিয়ে নেয়া হয়! এমন নানান রকমের তামাশা চলে!! অজ্ঞতা ও মূর্খতা মানুষকে আরো কত কী করতে বাধ্য করবে তা আল্লাহ মা'বুদই ভালো জানেন। তিনি যেন সবাইকে হিফাযত করেন।

দশ. পেশাদার ভিক্ষুকের উপদ্রব

রমাযান মাসে সত্তরগুণ সওয়াবের আশায় মানুষ বেশি বেশি দান-খয়রাত করে থাকে। তাই ভিক্ষুকের সংখ্যাও এ মাসে বহুগুণে বেড়ে যায়। সুস্থ, সবল, সুঠাম দেহের অধিকারী নারী-পুরুষ ভিক্ষার থালা হাতে নেমে পড়ে। মসজিদের প্রবেশপথে বেপর্দা মহিলারা বসে থাকে। কেউ ভাড়া করে বাচ্চা নিয়ে এসে মানুষের নজর কাড়ার জন্য রাস্তায় শুইয় রাখে। এ জাতীয় পেশাদার ভিক্ষুকদেরকে ভিক্ষা দেয়া জায়েয নেই। এদেরকে বাছ-বিচার ছাড়া যাকাত-ফিতরা দিলে তা-ও আদায় হবে না। কারণ, এদের অধিকাংশই সম্পদশালী। এরা যাকাত-ফিতরার উপযুক্তও নয়। এজন্য একান্ত অসহায়, অচল ছাড়া অন্য ভিক্ষুকদেরকে ভিক্ষা না দেয়া উচিত।

এগারো. হাফেয সাহেবদের দোহাই দিয়ে গণচাঁদা গণধোঁকাবাজি

অনেক মসজিদে হাফেযদের হাদিয়ার জন্য ঘোষণা দেয়া হয় কিংবা টেবিল বসানো হয়। কখনো লিস্ট ধরে বাসায় বাসায় যাওয়া হয়। হাফেযদের কথা শুনে মানুষ বেশি বেশি দান করে। পরে হাফেযদেরকে যৎসামান্য দিয়ে বাকিটা রেখে দেয়া হয়। কী আশ্চর্য ধোঁকাবাজি! এগুলোর কোনটাই শরীয়তসম্মত পদ্ধতি নয়। হাদিয়া দেয়া হয় ব্যক্তিগত মহব্বতের কারণে একান্তে। কেউ চাইলে নিজে গিয়ে সরাসরি হাফেয সাহেবকে হাদিয়া দিবে। আর গণচাঁদা না করে নিজেরা কয়েকজন মিলে হাফেযদের থাকা-খাওয়া ও যাতায়াত ভাড়ার ব্যবস্থা করবে।

বারো. ঘোষণা দিয়ে যাকাত দেয়া

অনেক ধনী লোক কারখানার সামনে নোটিশ টাঙিয়ে কিংবা মাইকিং করে যাকাত প্রদানের খবর প্রচার করে। ফলে হতদরিদ্র মানুষজন রাতেই এসে বাড়ির সামনে অবস্থান নেয়। হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কিতে হতাহতের ঘটনা ঘটে। পদপিষ্ট হয়ে কোথাও কোথাও নিহত হওয়ার কথাও শোনা যায়। কখনো পরিস্থিতি শান্ত করতে লাঠিবাজ দারোয়ান লেলিয়ে দেয়া হয়। সামান্য এক-দু'শ টাকা বা একটা শাড়ি-লুঙ্গির জন্য দীন-দুঃখী মানুষের এত দুর্ভোগ পোহাতে হয় শুধুমাত্র দাতার নির্বুদ্ধিতা ও লোক দেখানোর হীন মানসিকতার কারণে। ইসলামী নীতি হচ্ছে,

نعم الامير على باب الفقير وبئس الفقير على باب الامير. (احياء علوم الدين: حديث ١٤٣٠)

অর্থ : কতই না উত্তম সেই ধনী যে ছুটে যায় গরীবের দুয়ারে। আর কতই না হতভাগা সেই গরীব যে পড়ে থাকে ধনীর দ্বারে। (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন; হা.নং ১৪৩০)

ধনী নিজে গিয়ে গরীবের হাতে তার হক পৌঁছে দিয়ে আসবে। ধনীর এই স্বতঃসিদ্ধ নীতি উপেক্ষা করায় আজ গরীবরা সেই নিকৃষ্টতম পন্থা অবলম্বন করে লাঞ্ছিত হচ্ছে। উপযুক্ত কিনা যাচাই না করে এভাবে গণহারে যাকাত দিলেই যাকাত আদায় হয়ে যায় না। কারণ এদের মধ্যে অনেকে থাকে পেশাদার। তাদের ব্যাংক-ব্যালেন্স পর্যন্ত আছে। তাই তারা যাকাতের উপযুক্ত পাত্র নয়।

অনেকে রমাযানের অপেক্ষায় যাকাত আটকে রাখে। এটাও ঠিক নয়। সম্পদের সালতামামী হলে সাথে সাথেই হিসাব বের করে যাকাত আদায় করে দেয়া উচিত।

তেরো. সদকায়ে ফিতর আদায়ে কার্পণ্য ও দায়সারা ভাব

মানুষের ধন-সম্পদের স্তরভেদে সদকায়ে ফিতর নির্ধারণের জন্য শরীয়ত কয়েক ধরনের খাদ্য সামগ্রীর নির্দিষ্ট পরিমাণকে মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছে। যথা, গম বা আটা ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম। যব, কিশমিশ, খেজুর অথবা পনির ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন,

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ.

অর্থ : প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি যেন তার সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করে। (সূরা তালাক- ৭)

হাদীসে পাকে এসেছে, নববী যুগের পর হযরত উমর রাযি. বলতেন,

اذا وسع الله فوسعوا.

অর্থ : এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করেছেন। অতএব তোমরা উদার হস্তে খরচ করো। (সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ২২৯৮)

পূর্বোক্ত যে কোন একটি খাদ্য সামগ্রীর হিসাবে সদকায়ে ফিতর আদায় করে দিলে যদিও ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়, কিন্তু মানবিক দায় থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। কোটি কোটি টাকার মালিক পৌনে দুই সের গমের মূল্য ৫০ টাকা হারে ফিতরা আদায় করে কীভাবেই বা দায়মুক্ত হতে চান!

সদকায়ে ফিতরের মূল উদ্দেশ্য তো হচ্ছে ধনীর ঈদআনন্দে গরীবকে শামিল করা। বর্তমান বাজারে ৫০ টাকা হারে ফিতরা দিয়ে কি করে ঈদ উৎসব করা যায়! অথচ খেজুর হিসেবে ১০০০/১২০০ টাকা, কিশমিশ বা পনির হিসেবে ১৬৫০-১৭০০ টাকার একটি ফিতরা একটি পরিবারের ঈদের আনন্দ এনে দিতে পারে। তাই প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির উচিত নিজের সম্পদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বস্তুর হিসাব ধরে ফিতরা আদায় করা। কিন্তু বড় দুঃখজনক কথা! অঢেল সম্পদের মালিক, তিনিও ফিতরা আদায়ের জন্য দোকানে গিয়ে আটার দাম যাচাই করেন! এটা উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং গরীব-দুঃখীর উপর যুলুমের শামিল।

(৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

অনুশীলিত মুদারাবা পদ্ধতি

প্রসঙ্গ শরীয়া নীতি লঙ্ঘনের ধরন

মুফতী হাফিজুর রহমান মাদারীপুরী

ভূমিকা

পবিত্র আহার গ্রহণ ইবাদাত কবুলের পূর্বশর্ত। পবিত্র কুরআনের একাধিক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা হালাল এবং পবিত্রখাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসের অগণিত বিবরণেও নৈতিক উপায়ে অর্জিত পানাহার গ্রহণের ব্যাপারে সীমাহীন গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সেই নির্দেশনাই প্রদান করেছেন যা তিনি রাসূলগণকে প্রদান করেছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার করো এবং সৎকর্ম করো। নিশ্চয়ই তোমরা যা করো সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সবিশেষ অবহিত। (সূরা মু'মিনূন- ৫১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা সেসব পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার করো যেগুলো আমি তোমাদেরকে আহার্য হিসেবে দান করেছি। (সূরা বাকারাহ- ১৭২) অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধুলি-ধূসরিত ক্লান্ত-শ্রান্ত বদনে আকাশের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করে– হে আমার রব! হে আমার রব!! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং হারাম আহার্য দ্বারা তার দেহ পুষ্টি অর্জন করেছে; তার প্রার্থনা কিভাবে কবুল হবে? (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০১৫)

আজ যুগের উন্নয়নের ক্রমধারায় আয়-উপার্জনের নানা মাধ্যম সৃষ্টি হচ্ছে। আয়-উপার্জনের প্রাচীন এবং সর্বস্বীকৃত মাধ্যম হলো ব্যবসা। ব্যবসা-বাণিজ্যের রয়েছে দু'টি ধারা। (ক) নৈতিক তথা ইসলামিক ধারা। (খ) নৈতিকতা বিবর্জিত ধারা। দ্বিতীয় এ ধারাটিতে নৈতিকতা কোনো উপলক্ষ বা কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। যেমনটি প্রথম ধারাটিতে বৈধতা ও নৈতিকতা কেন্দ্রীয় চরিত্র ও উপলক্ষ হিসেবে বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে মনিটরিং করে। মুনাফা কম হোক যদি সেখানে বৈধতা ও নৈতিকতার উপস্থিতি থাকে তাহলে ইসলাম সে ব্যবসায়িক এ্যাক্টিভিটিসকে অনুমোদন দিবে। পক্ষান্তরে যদি কোথাও অফুরন্ত মুনাফার হাতছানি থাকে কিন্তু সেখানে নৈতিকতা ও বৈধতার নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে এ জাতীয় ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে অনুমোদন দিবে না ইসলাম। যুগের বিবর্তনে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া ও প্রয়োগের মাঝেও পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় ব্যবসায়িক যাবতীয় কার্যক্রমের বাগডোর পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার হাতে। ইসলাম বিরোধী শক্তিই আজ বিশ্ববাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে তারা নীতি নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে নিত্য নতুন ব্যবসায়িক পলিসি তৈরি করছে। তাদের মূল টার্গেট যেহেতু মুনাফা অর্জন তাই এক্ষেত্রে তারা এমন কোনো নীতি বা নৈতিকতাকে প্রশ্রয় দিবে না, যা তাদের একচেটিয়া মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। উপরন্তু বৈশ্বিক ব্যবসায়িক চ্যানেলটি এতটাই শক্তিমত্তা অর্জন করেছে যে, কেউ যদি এ স্রোতের বিপরীতে গিয়ে নীতি-নৈতিকতা বজায় রেখে বড় ধরনের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায় তার জন্য বিষয়টা বিষম দুরুহ হয়ে পড়বে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতিসহ বৈষয়িক সকল সেক্টরে একসময় মুসলিমদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের কূটকৌশল, আদর্শিক স্খলন এবং খেলাফত ব্যবস্থার বিলুপ্তির মত চতুর্মুখী ছোবলে মুসলিম জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃত অঙ্গন থেকে ছিটকে পড়ে। এ সুযোগে বিরোধী শক্তি জাগতিক সকল সেক্টরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণকে পাকাপোক্ত করে নেয়। বিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে এসে মুসলিমগণ অর্থনীতিতে কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ততদিনে অর্থনীতির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে বিরোধী বলয়ের হাতে। তবু হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলছে ইসলামী বাণিজ্যের কর্মধারা। হয়তো একদিন ফিরে আসবে ইসলামী বাণিজ্যের সে সোনালী অতীত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। ইসলামী শরীয়ার বাণিজ্য-নীতির সর্বোত্তম ও ইনসাফপূর্ণ একটি নীতি হলো মুদারাবা নীতি। আমরা বক্ষমাণ নিবন্ধে মুদারাবা পদ্ধতি এবং মুদারাবার প্রচলিত প্রয়োগিক রূপ রেখা সম্বন্ধে আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

ইতিহাসের ক্রমধারায় মুদারাবা বাণিজ্য

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজে মুদারাবা বাণিজ্য-নীতি প্রচলিত ছিল। তখন ব্যাপকভাবে ব্যবসায়িক এ পলিসিটির চর্চা হতো। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভের পূর্বে খাদীজা রাযি. এর ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব গ্রহণ করেছিলেন মুদারাবা পদ্ধতিতে। নবুওয়াত লাভের পর ব্যবসায়িক এ পদ্ধতিটি বহাল থাকে। ফলে সাহাবায়ে কেরামও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি প্রয়োগ করেন। (আল-মুহাল্লা বিল-আসার ৬/৪৯১, যাদুল মাআদ ১/১৫৪, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ লিইবনি কাসীর ১/৩৮০)

পবিত্র কুরআনে মুদারাবা বাণিজ্য

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অন্যরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে। (সূরা মুযযাম্মিল- ২০)

আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা ঐসব সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করেছেন যাঁরা ব্যবসার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতেন। এসব ব্যবসায়ীর অনেকেই মুদারাবার ভিত্তিতে সংগৃহীত পুঁজি নিয়ে মুনাফার লক্ষ্যে ভ্রমণ করতেন।

২। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা জুমু'আহ- ১০)

আয়াত দুটির অর্থ-ব্যাপকতায় মুদারাবা পদ্ধতিও আয়াতদ্বয়ের অন্তর্গত।

হাদীস ও আসারে মুদারাবা পদ্ধতি

১। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে মুদারাবা বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছেন। নবুওয়াত লাভের পর তাতে মৌন সমর্থন দিয়েছেন। সুতরাং মুদরাবা পদ্ধতিটি সম্মতিমূলক সুন্নাহ বা মৌন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

২। নাফে' রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর নিকট এতীমদের সম্পদ রক্ষিত থাকত। তিনি সে সম্পদের যাকাত আদায় করতেন, মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতেন। (আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী; হা.নং ১১৯৪২)

৩। শা'বী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রাযি. এর নিকট এতীমদের সম্পদ রক্ষিত থাকত। তিনি সে সম্পদ সমুদ্র বাণিজ্যে মুদারাবার ভিত্তিতে প্রদান করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ; হা.নং ২১৭৮৪)

৪। আলা ইবনে আব্দুর রহমান এর পিতামহ থেকে বর্ণিত, উসমান ইবনে আফফান রাযি. তাকে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করার জন্য অর্থ প্রদান করেছিলেন এ শর্তে যে, যা লাভ হবে তা অর্ধার্ধি হারে বণ্টিত হবে। (মুআত্তা ইমাম মালেক; হা.নং ১৩৭৩)

৫। উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. এর পুত্র আব্দুল্লাহ এবং উবাইদুল্লাহ রাযি. ইরাক অভিমুখে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে জিহাদের উদ্দেশে বের হলেন। জিহাদ থেকে ফেরার পথে তারা দুজন বসরার গভর্নর আবূ মুসা আশআরী রাযি. এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি তাদেরকে অভিবাদন জানালেন। এরপর তিনি তাদেরকে বললেন, যদি আমার পক্ষে তোমাদের জন্য উপকারী কিছু করা সম্ভব হতো তাহলে আমি তা করতাম। এরপর বললেন, ও আচ্ছা, আমার এখানে বাইতুল মাল (অর্থ মন্ত্রণালয়) এর কিছু সম্পদ রয়েছে। এগুলোকে আমি আমীরুল মুমিনীন এর নিকট পাঠাতে চাচ্ছি। সুতরাং এগুলোকে আমি তোমাদের দুজনকে ঋণ হিসেবে প্রদান করছি। এর মাধ্যমে তোমরা ইরাক থেকে কিছু পণ্য ক্রয় করে মদীনায় গিয়ে বিক্রি করবে। আর মূল পুঁজি আমীরুল মুমিনীন এর নিকট পৌঁছে দিবে। এ ব্যবসায় লাভ যা হবে তা তোমাদের দু জনের। তারা বললো, আপনার এ প্রস্তাবে আমরা প্রীত হলাম। আবূ মুসা আশআরী রাযি. তাদের হাতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ তুলে দিয়ে আমীরুল মুমিনীনকে পত্র লিখলেন, আপনার দু ছেলের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ গ্রহণ করবেন। তারা ইরাক থেকে পণ্য ক্রয় করে মদীনায় নিয়ে বিক্রি করলো। এতে তাদের বেশ মুনাফা অর্জন হলো। যখন তারা আমীরুল মু'মিনীনকে মূলধন দিতে গেলেন তখন তিনি বললেন, তোমাদের যেমন ঋণ দেয়া হয়েছে তদ্রূপ মুজাহিদ বাহিনীর প্রত্যেককেই কি ঋণ দেয়া হয়েছে? তারা বলল, না। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বললেন, তোমরা আমীরুল মু'মিনীনের ছেলে বলে তোমাদের ঋণ দেয়া হয়েছে। সুতরাং লাভসহ পুরো অর্থ দিয়ে দাও। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. নীরব রইলেন। তবে উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বললেন, আমীরুল মুমিনীন! এটা আপনার জন্য উচিত নয়। যদি এ সম্পদ নষ্ট কিংবা ধ্বংস হয়ে যেত তবে তবে আমরা এর ক্ষতিপূরণ দিতাম। তখনো উমর রাযি. বললেন, লাভসহ পুরো অর্থই দাও। এবারও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. নীরব থাকলেন। আর উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর তার কথাকে পুনর্ব্যক্ত করলেন। তখন উমর রাযি. এর সভাসদদের একজন বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ! প্রদত্ত এ অর্থকে যদি মুদারাবা হিসেবে প্রদত্ত অর্থ গণ্য করতেন ! তখন উমর রাযি. বললেন, আচ্ছা, এ অর্থকে মুদারাবা ভিত্তিতে প্রদত্ত অর্থ হিসেবে গণ্য করা হলো। ফলে উমর রাযি. মূলধনের সাথে লাভের অর্ধেক গ্রহণ করলেন। আর উমর রাযি. এর পুত্র আব্দুল্লাহ এবং উবাইদুল্লাহ রাযি. লাভের অর্ধেক গ্রহণ করলেন। (মুআত্তা ইমাম মালেক; হা.নং ১৩৭২)

মুদারাবা ব্যবসার তাৎপর্য

সমাজে এমন অনেক লোক আছে যাদের সম্পদ আছে কিন্তু সে সম্পদকে বিনিয়োগ করার মত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা তাদের নেই। এজন্য তাদের প্রয়োজন অন্যের সহযোগিতা। অন্যদিকে সমাজে এমন লোকও রয়েছে যাদের ব্যবসা পরিচালনা করার যোগ্যতা ও দক্ষতা আছে কিন্তু ভালভাবে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি নেই। এ কারণে তাদেরকে অন্যের নিকট থেকে পুঁজি গ্রহণ করতে হয়। এ দু' পক্ষের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় ঘটানোর জন্য মুদারাবা পদ্ধতি বৈধ করা হয়েছে। যাতে দু' পক্ষই আর্থিক কল্যাণ অর্জন করতে পারে।

মুদারাবা নীতির আভিধানিক পরিচিতি

মুদারাবা (مضاربة) শব্দটি দারব (ضرب) শব্দমূল হতে উদ্ভূত। আরবী ভাষায় শব্দটি প্রহার করা, আঘাত করা, অন্বেষণ করা, দৃষ্টান্ত দেয়া, পরিভ্রমণ করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে শব্দটি পরিভ্রমণ করা অর্থে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ

অর্থ : অন্যরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে। (সূরা মুযযাম্মিল-২০)

আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা ঐসব সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করেছেন যারা ব্যবসার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতেন। এসব ব্যবসায়ীর অনেকেই মুদারাবার ভিত্তিতে সংগৃহীত পুঁজি নিয়ে মুনাফার লক্ষ্যে ভ্রমণ করতেন। মুদারাবা ব্যবসার এ পদ্ধতিকে মুকারাযা বা কিরায নামেও অভিহিত করা হয়।

মুদারাবা নীতির পারিভাষিক পরিচিতি

ইসলামী শরীয়ার পরিভাষায়, মুদারাবা এমন একটি অংশীদারি কারবার যেখানে দু'টি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন এবং অপরপক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করেন। ব্যবসায়ে লাভ হলে পূর্ব চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষের মাঝে তা বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে তার দায় বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে সবটুকু লোকসান পুঁজিদাতা বহন করলেও মুদারিব তার শ্রম ও তৎপরতার কোনো পারিশ্রমিক না পাওয়াটাই তার লোকসান হিসেবে গণ্য হয়। তবে যদি মুদারিব কর্তৃক নিয়ম লঙ্ঘন, অবহেলা বা চুক্তিভঙ্গের কারণে লোকসান হয় তাহলে মুদারিবকে লোকসানের দায় বহন করতে হবে। উল্লেখ্য, মুদারাবা ব্যবসায় স্বাভাবিক লোকসান হয়ে পুঁজি ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রথমত পূর্বতন লভ্যাংশ দ্বারা পুঁজির সমন্বয় করা হবে। লভ্যাংশ দ্বারা পুঁজির সমন্বয় না হলে অবশিষ্ট ক্ষতি পুঁজিদাতাই বহন করবে। এ ক্ষেত্রে মুদারিব বা উদ্যোক্তার উপর এর কোনো দায় আরোপিত হবে না। (শরহুল মাজাল্লাহ ৪/৩৬৩)

মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে বলা হয় ছাহিবুল মাল (صاحب المال) আর ব্যবসা পরিচালনাকারী-পক্ষকে বলা হয় মুদারিব (مضارب)। আর বিনিয়োগকৃত অর্থকে

বলা হয় রা'সুল-মাল (رأس المال) বা পুঁজি।

মুদারাবার শ্রেণীবিভাগ

চুক্তির ভিত্তিতে মুদারাবা বিনিয়োগ দু'প্রকার। যথা-

১. মুদারাবা মুতালাকা বা সাধারণ মুদারাবা। যে মুদারাবা ব্যবসায় মুদারিবকে কোনোরূপ শর্ত আরোপ করা ব্যতিরেকে সাহিবুল মাল কর্তৃক ব্যবসা করার অনুমতি দেয়া হয় তাকে আল-মুদারাবাতুল মুতলাকাহ বা সাধারণ মুদারাবা বলা হয়।

২. মুদারাবা মুকাইয়াদা বা বিশেষ মুদারাবা। যে মুদারাবা ব্যবসায় সাহিবুল মাল ব্যবসার ধরন, মেয়াদ ও স্থান ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দেয় তাকে আলমুদারাবা আলমুকাইয়াদা বা বিশেষ মুদারাবা বলা হয়। (মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ২৭১)

মুদারাবা বাণিজ্যের শর্তাবলি

ক. চুক্তি সংক্রান্ত শর্তাবলি

১। মুদারাবা কারবারে একপক্ষ অপরপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। তাই একপক্ষকে অপরপক্ষের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হতে হবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ ৫/৫৭৪)

২। মুদারাবা একটি বিশ্বস্ততার চুক্তি। তাই মুদারিবের অবহেলা, অসদাচরণ, চুক্তি ভঙ্গ ইত্যাদি কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে কারবারে লোকসান হলে তার জন্য মুদারিব দায়ী হবে না। (ইতরে হিদায়া; পৃষ্ঠা ২১৬)

খ. মূলধন সংক্রান্ত শর্তাবলি

১। মুদারাবার মূলধন নগদ অর্থ হতে হবে। তবে ইমাম আহমদ রাহ. এর মতে অন্যান্য পণ্য সম্পদও মুদারাবার মূলধন হতে পারে। অতএব বিশেষ প্রয়োজনে পণ্যসম্পদকেও মুদারাবার মূলধন হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। (ফাতাওয়া উসমানী ৩/৩৮)

২। ভুল বুঝাবুঝি এড়ানোর জন্য চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের মূলধনের পরিমাণ, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ ৫/৫৭৬)

৩। মূলধন বর্তমান থাকতে হবে; ঋণ কিংবা অবর্তমান থাকতে পারবে না। সুতরাং মুদারিবের কাছে সাহিবুল মালের প্রাপ্য কিংবা অন্য কারো কাছে সাহিবুল মালের প্রাপ্য ঋণকে মুদারাবা মূলধন হিসেবে গণ্য করা যাবে না। (আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ ৫/৫৭৬)

৪। মুদারাবা চুক্তি কার্যকর করতে চুক্তিকৃত মূলধনের সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদারিবের কাছে সমর্পণ করতে হবে এবং তাকে মূলধন ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হবে। মূলধনের উপর সাহিবুল মালের হস্তক্ষেপ বিদ্যমান থাকলে উক্ত মূলধন দ্বারা মুদারাবা কারবার শুদ্ধ হবে না। (আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ ৫/৫৭৮, ইতরে হিদায়া; পৃষ্ঠা ২১৫)

গ. মুনাফা সংক্রান্ত শর্তাবলি

১। সাহিবুল মাল এবং মুদারিবের মধ্যে লাভের হার বা অনুপাত উল্লেখ থাকতে হবে। যথা অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি। লাভের অনুপাতের পরবির্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ নির্ধারণ করা বৈধ নয়। (আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ ৫/৫৮০)

২। চুক্তির সময় লাভ বন্টনের হার উল্লেখ না করা হলে মুদারাবা চুক্তি ফাসেদ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় মুদারিব তার শ্রমের বাজারমূল্য পাবে এবং সম্পূর্ণ মুনাফা রব্বুল মাল পাবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ ৫/৫৮২, ইতরে হিদায়া; পৃষ্ঠা ২১৬)

৩। মূলধন অক্ষত থাকা ব্যতীত মুদারাবার লাভ ধর্তব্য হবে না। মুদারাবার কোনো কার্যক্রমে লোকসান হলে অন্যান্য কার্যক্রমের প্রাপ্ত লাভ দ্বারা তা পূরণ করা হবে। পূর্বের ক্ষতিকে পরবর্তী লাভের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং চুক্তির মেয়াদ শেষে মোট লাভের ভিত্তিতে প্রকৃত লাভ নির্ণয় করা হবে। তবে যদি মাস বা বৎসরান্তে চূড়ান্ত হিসাব নিকাশের মাধ্যমে লভ্যাংশ বণ্টিত হয় তাহলে পূর্বতন প্রদত্ত লভ্যাশ দ্বারা হিসাব পরবর্তী ক্ষতির সমন্বয় করা হবে না। এক্ষেত্রে রাব্বুল মালই পূর্ণ ক্ষতি বহন করবে। (ইতরে হিদায়া; পৃষ্ঠা ২১৬)

৪। মুদারিব তার কোনো সম্পদ মুদারাবা ব্যবসার সাথে একীভূত করে ফেললে নিজের সম্পদ দ্বারা ব্যবসায়ের অংশীদার এবং অন্যের (সাহিবুল মালের) সম্পদ দ্বারা মুদারিব বিবেচিত হবে। মুদারিব তার নিজস্ব পুঁজির মাধ্যমে অংশীদার হিসেবে লাভ পাবেন এবং মুদারাবা কারবারের লাভ তার ও সাহিবুল মালের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত হবে। (মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ২৭৪, ফাতাওয়া উসমানী ৩/৫৪)

মুদারাবা চুক্তির সময়সীমা

মুদারাবা চুক্তির মেয়াদ উল্লেখ করা মুদারাবার শর্তাবলির অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ মুদারাবা এমন চুক্তি যা যে কোনো সময় বাতিল করা যায়। তবে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে মুদারাবা চুক্তির সময় সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে। (আল-মউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়্যাহ ৩৮/৬৪)

মুদারাবা কারবারের অর্থ পুনঃবিনিয়োগ

সাহিবুল মালের অনুমতি ব্যতীত মুদারিব মূলধন পুনরায় অন্য কারো কাছে বিনিয়োগ করতে পারবে না। তিনি এরূপ করলে সীমালঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

মুদারাবা কারবারের খরচাদি

মুদারিব তার ব্যক্তিগত খরচাদি ও মুদারাবা কারবারের পরোক্ষ ব্যয় নিজের তহবিল হতে বহন করবে। তবে মুদারাবা কারবারের প্রত্যক্ষ ব্যয় মুদারাবা ফাণ্ড থেকে বহন করবে। (কাযায়া ফিকহিয়্যা মুআসারাহ ২/১৬৭)

মুদারিবের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

মুদারাবা চুক্তির উদ্দেশ্যাবলি সফলভাবে অর্জন করার জন্য মুদারিব তার সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা, মেধা ও শক্তি নিয়োগ করবে। তিনি সাহিবুল মাল বা মূলধনদাতাকে নিশ্চয়তা দিবেন যে, তার মূলধন গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে দক্ষ হাতে সর্বোত্তম খাতে বিনিয়োগ করা হবে। সারকথা মুদারিব মুদারাবার অর্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ন্যাসরক্ষক (Trustee), অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি (Agent), মুনাফার ক্ষেত্রে অংশীদার (Partner), লোকসানের ক্ষেত্রে দায়মুক্ত (Innocent), মুদারাবা চুক্তি ফাসেদ বা বিনষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিক (Employee) এবং মুদারাবা নীতি বিরুদ্ধ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দায়ী (Liable) হিসেবে গণ্য হবে। (ইতরে হিদায়া; পৃষ্ঠা ২১৬, শিরকাত ওয়া মুযারাবাত আসরে হাযের মেঁ; পৃষ্ঠা ২৪০)

মুদারিবের কার্যক্রম

১। মুদারিব সর্বাবস্থায় একজন আমানতদার হিসেবে বিনিয়োগ কার্যক্রম তদারকি করবে।

২। সাহিবুল মালের অর্থ দ্বারা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে মুদারিব উকিল বা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে।

৩। মুনাফা হলে তা শরীক বা অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করবে।

৪। দায়িত্বে অবহেলাজনিত কারণে কারবারে লোকসান হলে তার জন্য মুদারিবই দায়ী থাকবে।

৫। কোনো কারণে মুদারাবা ফাসেদ হলে কারবারে লাভ লোকসান যাই হোক মুদারিব শুধুমাত্র পারিশ্রমিক পাবে।

৬। মুদারিব তার উদ্যোক্তাসুলভ দক্ষতা এবং পেশাগত ও কৌশলগত যোগ্যতা দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম- এমন বিনিয়োগ কিংবা ব্যবসায়িক কার্যক্রমেই কেবল অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৭। কারবারের জন্য আপাত দৃষ্টিতে ঝুঁকিমুক্ত স্থান ও বাজার নির্বাচন করবে।

৮। শর্তযুক্ত মুদারাবার ক্ষেত্রে মুদারিব শর্তের বাইরে কিছুই করতে পারবে না।

৯। সাহিবুল মাল কারবারের কার্যাবলি সম্পাদনে মুদারিবের সাথে অংশগ্রহণের শর্ত আরোপ করতে পারবে না। সাহিবুল মাল মুদারিবের উপর এমন কোনো শর্ত আরোপ করতে পারবে না যাতে মুদারিবের কাজ বাধাগ্রস্থ হয়।

১০। মুদারিব প্রচলিত বিধিসম্মত রীতি অনুযায়ী ব্যবসার আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ সকল কাজ সম্পাদনা করবে। এটা মুদারিব হিসেবে তার দায়িত্ব। তাই এর জন্য সে অতিরিক্ত কোনো বিনিময় দাবি করতে পারবে না।

১১। মুদারিব গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে মালামাল বিক্রি করতে পারবে না, আবার বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যেও মালামাল ক্রয় করতে পারবে না।

১২। মুদারিব মুদারাবা ফাণ্ড থেকে কোনো প্রকার ঋণ, হাদিয়া, অথবা দান-সদাকা করতে পারবে না। অনুরূপ মুদারিব ব্যবসায়িক পলিসি হিসেবে গণ্য বিষয় ছাড়া মুদারাবা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যাপারে কোনো ছাড় দিতে পারবে না।

মুদারিব কর্তৃক চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন

মুদারাবা চুক্তিতে সাহিবুল মাল কর্তৃক নির্ধারিত সীমা কিংবা চুক্তির উদ্দেশ্য লঙ্ঘন বা চুক্তির কোনো ধারা ভঙ্গ করলে মুদারিব দোষী সাব্যস্ত হবে এবং মুদারাবা ফাণ্ডের আমানতদারের পরিবর্তে তিনি গ্যারান্টর গণ্য হবেন। অর্থাৎ তিনি ফাণ্ডের আমানতদার থাকবেন না; বরং একজন ঋণগ্রহীতা সাব্যস্ত হবেন। (মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ২৭৫)

মুদারাবা চুক্তি ফাসিদ হওয়ার কারণ

১। মুদারাবা চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তাবলির কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে চুক্তিটি ফাসিদ হয়ে যাবে।

২। মুদারাবা চুক্তি লঙ্ঘন করলে কিংবা চুক্তির মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কাজ করলে মুদারাবা চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে।

৩। মুদারিব বা সাহিবুল মাল দু'জনের কেউ মৃত্যুবরণ করলে মুদারাবা চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। (মাজাল্লাতিল আহকামিল আদলিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ২৭৫-২৭৬)

মুদারাবা চুক্তির অবলুপ্তি

নিম্নলিখিত অবস্থায় মুদারাবা চুক্তি অবলুপ্ত হতে পারে-

১। শর্তহীন মুদারাবার ক্ষেত্রে দুপক্ষের যে কোনো একপক্ষ মুদারাবা কারবার অবলুপ্ত করতে পারে।

২। শর্তযুক্ত মুদারাবার ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে যে কোনো সময় মুদারাবা চুক্তি অবলুপ্ত করা যায়।

৩। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে পূর্বনির্ধারিত সময় শেষ হলে মুদারাবা চুক্তি অবলুপ্ত হয়ে যায়।

৪। মুদারাবা কারবারের মূলধন সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট অথবা লোকসান হলে মুদারাবা চুক্তি অবলুপ্ত হয়ে যায়।

৫। মুদারিবের মৃত্যু হলে অথবা মুদারিব কোম্পানির অবলুপ্তি ঘটলে মুদারাবা চুক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মুনাফা বণ্টনের সময় সাহিবুল মালের উপস্থিতি

সাহিবুল মালের উপস্থিতি ব্যতীত লাভ থেকে নিজের অংশ নিয়ে নেয়া মুদারিবের জন্য বৈধ নয়। সম্পদ বণ্টন এবং মুদারিব কর্তৃক নিজ অংশ গ্রহণ করার সময় সাহিবুল মালের উপস্থিতি শর্ত।

প্রচলিত মুদারাবা ব্যবস্থার বাস্তবতা

মুদারাবা হলো একটি সর্বোত্তম আদর্শ বিনিয়োগ ব্যবস্থা, যা ইসলামী শরীয়ার স্বাতন্ত্র্য, সাম্য এবং ইনসাফ ও ন্যায়ের রক্ষাকবচ। ফলে ইসলামী ভাবধারার আলোকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে আগ্রহী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মুদারাবা ব্যবস্থাটিকে ব্যাপকভাবে অনুশীলন করে থাকে। মৌলিকভাবে দু'টি ধারায় এ ব্যবস্থাটি অনুশীলিত হয়ে থাকে। (ক) ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা, (খ) ইসলামী নাম ধারণ করে গড়ে উঠা বিভিন্ন সমিতি ও সোসাইটি।

প্রচলিত মুদারাবা বিনিয়োগে যেভাবে শরীআহ লঙ্ঘিত হয় বা হতে পারে-

১। মুদারাবা চুক্তির সমস্ত বিষয় লিখিত ও স্পষ্ট না হওয়া। কারণ এতে করে পরবর্তীতে লাভ বণ্টণ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে, যা শরীয়া লঙ্ঘনের কারণ।

২। মুদারিব কর্তৃক সাহিবুল মালের সম্পদের সাথে নিজের সম্পদ মিশ্রণ করে ব্যবসা করা, অথচ পৃথক কোনো হিসাব সংরক্ষণ না করা।

৩। মুদারিবের জন্য আবশ্যক হলো, ব্যবসার সমস্ত হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। এক্ষেত্রে তার উদাসীনতা শরীয়া লঙ্ঘনের কারণ হতে পারে।

৪। চুক্তিতে উল্লিখিত মুনাফা বণ্টনের নীতিমালা লঙ্ঘন করে সাহিবুল মালকে মুনাফা দেয়া হলে কিংবা ব্যবসায় লাভ হোক বা না হোক মুদারিব কর্তৃক সাহিবুল মালকে লাভ দেয়া হলে শরীয়া লঙ্ঘন হবে।

৫। উভয়পক্ষের সম্মতি ব্যতীত একতরফাভাবে চুক্তি ভঙ্গ করলে শরীয়া লঙ্ঘন হবে।

৬। লাভ ক্ষতি যাই হোক উভয়পক্ষই অংশীদার হবে- এরূপ শর্ত করা হলে শরীয়া লঙ্ঘন হবে।

৭। মুদারাবা বাণিজ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত সমিতি, সোসাইটি এবং কোম্পানীগুলোর পরিচালকগণ হলো প্রতিনিধি। আর সমিতি, সোসাইটি ও কোম্পানি হলো মুদারিব। মুদারিবের প্রতিনিধিদের বেতনাদি মুদারিবের দায়িত্বে অর্পিত। তাদের বেতন-ভাতার অর্থ মুদারাবা ব্যবসার পুঁজি থেকে গ্রহণ করা বৈধ নয়। অথচ সোসাইটি সমিতিগুলোর সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা মুদারাবা ব্যবসার পুঁজি থেকে প্রদান করা হয়। এটা সুস্পষ্ট শরীয়াহ লঙ্ঘন। (আল-মুগনী ৭/১৬৩, বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মুআসারাহ ২/১৬৭)

৮। সোসাইটি সমিতির সদস্য ফরম, কর্মনির্দেশিকা, প্রচারপত্র ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি তৈরি যেহেতু মুদারিবের কাজ তাই এ সকল কাজের ব্যয়ভারও সে বহন করবে। অথচ সোসাইটিগুলোতে এ সকল কাজের ব্যয়ভার মুদারাবা ব্যবসার পুঁজি থেকে নির্বাহ করা হয়। এটা শরীয়াহ লঙ্ঘন।

৯। প্রচলিত সোসাইটি বা সমিতিগুলোতে সদস্য তথা রাব্বুল মাল সংগ্রহের নামে মুদারাবা ব্যবসার অর্থ থেকে মাঠকর্মীদের কমিশন প্রদান করা হয়। মুদারাবা তহবিল থেকে এভাবে মাঠকর্মীদের কমিশন প্রদান করা মুদারাবা নীতি পরিপন্থী। এটা আদৌ বৈধ নয়।

১০। সোসাইটিগুলোতে মূলধন ফেরত ও লাভ প্রদানে শর্তারোপ করা হয়। যথা জমাকারী তথা রাব্বুল মাল এক বছরের পূর্বে তার মূলধন ফেরত নিতে পারবে না এবং দুই বছর পূর্বে টাকা ফেরত নিলে কোনো লভ্যাংশ পাবে না। এতে করে জমাকারীকে (রাব্বুল মাল) পূর্ণ বা

আংশিক মুনাফা থেকে বঞ্চিত করা হয়। যা সুস্পষ্ট শরীয়াহ নীতির লঙ্ঘন।

১১। সদস্য (রাব্বুল মাল) থেকে ভর্তি ফি, পুনঃভর্তি ফি গ্রহণ করা হয়। রাব্বুল মাল থেকে এ ধরনের ফি গ্রহণের বৈধতা ইসলামী শরীয়তে নেই। কারণ এগুলো হয় ঘুষ না হয় আর্থিক দণ্ড, যার কোনোটি ইসলামী শরীয়া মতে বৈধ নয়।

১২। কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মুদারিবের জন্য মুনাফার হার নির্দিষ্ট থাকে। সাথে সাথে তার শ্রমের জন্য সে পারিশ্রমিকও গ্রহণ করে থাকে। এটা সুস্পষ্ট শরীয়াহ লঙ্ঘন। (ফাতাওয়া উসমানী ৩/৩৬)

১৩। কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত মুদারাবা চুক্তি বিলুপ্ত না করার শর্ত করা হয়। এ ধরনের শর্তারোপও মুদারাবা নীতির পরিপন্থী। এতে রাব্বুল মালের মুনাফার দায় গ্রহণ করা হয়। এগুলো ইসলামী শরীয়াতে বৈধ নয়। (ফাতাওয়া উসমানী ৩/৩৬)

সারকথা, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাপনায় অসংখ্য সমিতি, সোসাইটি এবং কোম্পানি এরূপ রয়েছে যেখানে মুদারাবা পদ্ধতির অনুশীলন করা হয়। কিন্তু সেখানে দেখা যায় আত্মসাত, খেয়ানত, রিশওয়াত, গারার, গাশ জাতীয় মুদারাবা নীতি পরিপন্থী অসংখ্য বিষয়ের উপস্থিতিতি রয়েছে। ফলে ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে এসব আর্থিক সংস্থার মুদারাবা কারবার বৈধ নয়। এ জাতীয় আরো বহু প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে রয়েছে যেগুলোতে উপরোক্ত শরীয়ত পরিপন্থী বিষয়গুলোর সবগুলো কিংবা কেনো কোনোটি বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের সংস্থা বা সোসাইটি গঠন করা, এগুলোর সদস্য, কর্মী ও মধ্যস্থতাকারী হওয়া এবং মুদারাবার ভিত্তিতে মানুষের টাকা জমা করে তা নিজ ইচ্ছামত বিলি-বণ্টন করা সম্পূর্ণ অবৈধ। যৌথ মূলধনী কারবার করার জন্য ইসলামী শরীয়াতে মুদারাবা ও মুশারাকার পদ্ধতির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কেউ বৈধ পন্থায় এ ধরনের কারবার করতে আগ্রহী হলে শুরু থেকেই শরীয়তসম্মত নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করে এবং সকল প্রকার নিষিদ্ধ কার্যক্রম থেকে মুক্ত থেকে তা করার অবকাশ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে সাম্যক ধারণা লাভ করে ফিকহ ফতওয়া বিষয়ে অভিজ্ঞ মুফতীয়ানে কেরাম থেকে নীতিমালা অনুমোদন করিয়ে নিয়ে তদানুযায়ী কর্মপন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।

লেখক : আমীনুত তা'লীম, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, ঢাকা

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

১৪৩৮-৩৯ হিজরী শিক্ষাবর্ষের ভর্তিতথ্য

(ভর্তিচ্ছুক নতুন ছাত্রদের জন্য প্রযোজ্য)

আরবী তাং	ইংরেজি তাং	রোজ	কার্যক্রম
৭ শাওয়াল	২ জুলাই	রবিবার	মাদরাসা খোলা, সকল জামাআতের ভর্তিচ্ছুক নতুন ছাত্রদের ভর্তিফরম সংগ্রহ, তাইসীর থেকে নাহবেমীর পর্যন্ত ছাত্রদের ভর্তিপরীক্ষা (মৌখিক) ও ভর্তি।
৮ শাওয়াল	৩ জুলাই	সোমবার	হিদায়াতুন্নাহু থেকে তাখাস্সুস পর্যন্ত ভর্তিচ্ছুক ছাত্রদের ভর্তিপরীক্ষা (লিখিত ও মৌখিক)।
৯ শাওয়াল	৪ জুলাই	মঙ্গলবার	ফলাফল প্রকাশ ও ভর্তি (পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ঐ দিন ভর্তি হওয়া লাযেম, পরে সুযোগ থাকবে না)।
১০ শাওয়াল	৫ জুলাই	বুধবার	মকতব, নাযেরা ও হিফয বিভাগে ভর্তিচ্ছুক ছাত্রদের ভর্তিপরীক্ষা ও ভর্তি।

শর্তাবলী

১. ১৪৩৮-৩৯ হিজরী শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছুক নতুন/পুরাতন সকল ছাত্রের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র এবং পাসপোর্ট সাইজ ২কপি ছবি লাগবে।
২. নতুন ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষায় কোন একটি প্রশ্নের উত্তর উর্দূতে দিতে হবে।

পরীক্ষার বিষয়

ক্র.	জামাআত	বিষয়
০১	তাফসীরুল কুরআন বিভাগ	জালালাইন, আল-ফাউযুল কাবীর
০২	উলূমুল হাদীস বিভাগ	বুখারী ১ম, শরহু নুখবাতিল ফিকার
০৩	ইফতা বিভাগ	বুখারী, হিদায়া ৩য়, নূরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ)
০৪	তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস)	মিশকাত, হিদায়া ৪র্থ
০৫	নিহায়ী সানী (মিশকাত)	জালালাইন, হিদায়া ১ম ও ২য়
০৬	নিহায়ী আউয়াল (জালালাইন)	শরহেবেকায়া, নূরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ)
০৭	সানাবী সানী (শরহেবেকায়া)	শরহেজামী, কানযুদ্দাকাইক
০৮	সানাবী আউয়াল (শরহেজামী)	কাফিয়া, কুদূরী
০৯	উস্তানী সালিস (কাফিয়া)	হিদায়াতুন্নাহব, ইলমুস সীগাহ
১০	উস্তানী সানী (হিদায়াতুন্নাহু)	নাহবেমীর, ইলমুস সরফ ৩য় ও ৪র্থ/পাঞ্জেগঞ্জ
১১	উস্তানী আউয়াল (নাহবেমীর)	মীযান মুনশাঈব/ইলমুস সরফ ১ম ও ২য়, আরবী আদব
১২	ইবতিদায়ী সানী (মীযান)	তাইসীর, ফারসী কী পেহলী কিতাব
১৩	ইবতিদায়ী আউয়াল (তাইসীর)	উর্দূ কায়িদা, নাযিরা (গাইরে হাফেযদের জন্য)

বি.দ্র. উপরোল্লিখিত জামাআতগুলোর লিখিত পরীক্ষার সাথে সাথে মতনখানীও পরীক্ষা হবে।

-জামি'আ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

সাঈদুর রহমান
মিরপুর, ঢাকা

২১৯ প্রশ্ন : (ক) তারাবীহর হাফেয সাহেব যদি ছাত্র হন আর তাকে কিতাব ক্রয় বা ভর্তি খরচ বা সারা বছরের হাত খরচের জন্য কিছু সহযোগিতা করা হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা বা প্রদান করার বিধান কি?

(খ) বিনিময় ছাড়া ভালো কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট ও ভালো হাফেয খুব কম পাওয়া যায়। আর নিয়ম আছে الضرورة تبيح المحظورات। এর ভিত্তিতে তাদেরকে টাকা দিয়ে রেখে তারাবীহ পড়ানো যাবে কি? অথবা হাফেযদেরকে কিছু বিনিময় দেয়া নেয়ার প্রথা প্রবলভাবে প্রচলিত এজন্য عموم بلوی (ব্যাপক সমস্যা) হিসেবে তাদেরকে দেয়া বৈধ আছে কি?

(গ) যদি নিজ মহল্লায় অথবা আশপাশে নিকটে এমন কোন মসজিদ পাওয়া না যায় যেখানে টাকা নেয়া ছাড়া তারাবীহ পড়ানো হয়, এমতাবস্থায় মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে তারাবীহ পড়তে হবে, নাকি নিজ ঘরে একাকি আদায় করে নিবে?

(ঘ) হাফেয সাহেবকে যদি রমাযান মাসে দুই/এক ওয়াক্তের জন্য সহকারী ইমাম অথবা মুআযযিন হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় এবং সেজন্য বেতন কিংবা বোনাস হিসেবে বিশেষ অংকের টাকা প্রদান করা হয় তাহলে জায়েয হবে কি?

অথবা যদি হাফেয সাহেবদেরকে সারা বছর দুই/এক ওয়াক্ত নামাযের জন্য নিয়োগ দেয়া হয় এবং প্রতি মাসে দুই/এক দিন নামায পড়ান। সে হিসেবে তার জন্য বিশেষ অংকের বেতন ধার্য করা হয় যা বছর শেষে রমাযানে একসঙ্গে পরিশোধ করা হয় অথবা সারা বছর মাসে মাসে আদায় করা হয়; তারাবীহর জন্য আলাদা কোন টাকা দেয়া না হয়, তাহলে জায়েয হবে কিনা?

অথবা যদি মসজিদের নিয়মিত স্টাফ তথা খতীব, ইমাম, মুআযযিন, খাদেম হাফেয হয় এবং তারাবীহ পড়ান। আর তাদেরকে স্বাভাবিক বেতনের চেয়ে বেশি দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে বৈধ হবে কিনা?

উল্লেখ্য, উক্ত স্টাফদের মধ্য থেকে যিনি তারাবীহ পড়াননি তাকে অতিরিক্ত বোনাস দেয়া হয় না।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো যদি বৈধ না হয় তাহলে কুরআন-হাদীসের আলোকে কোন বৈধ পন্থা বর্ণনার জন্য অনুরোধ করছি।

উত্তর : (ক) মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন সকল উলামায়ে কেরামের মতে খতম তারাবীহ ও সূরা তারাবীহ উভয়টির বিনিময় দেয়া এবং নেয়া উভয়টিই নাজায়েয এবং হারাম।

তারাবীহর হাফেয সাহেবকে কিতাব ক্রয় বা মাদরাসায় ভর্তির খরচ কিংবা সারা বছরের হাত খরচের জন্য কিছু দিতে চাইলে তারাবীহর বিনিময় হিসেবে নয় বরং তাকে ব্যক্তিগতভাবে হাদিয়া দেয়া যাবে। এটাও মসজিদ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুসল্লীদের কাছ থেকে উঠিয়ে বা মসজিদের ফান্ড থেকে দেয়া যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হাফেয সাহেবদের থাকা-খাওয়া ও যাতায়াতের সম্মানজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে বরং করা উচিত। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/২৪৩, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৪১৬, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৭৭৩৯, ফাতাওয়া উসমানী ১/৫০৪)

(খ) الضرورة تبيح المحظورات এর ভিত্তিতে হাফেয সাহেবদের টাকা দিয়ে রেখে তারাবীহ পড়ানো যাবে না। এমনকি عموم بلوی (ব্যাপক সমস্যা) হিসেবেও তাদেরকে টাকা দেয়া বৈধ নয়। বরং এক্ষেত্রে عموم بلوی এবং ضرورت এর দাবীও সত্য নয়। কেননা খতম তারাবীহ শরীয়ত মতে জরুরী নয়। সুতরাং عموم بلوی ও প্রমাণিত নয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/২৪৩, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২০৯, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৭৭৩৯, তানকীহুল ফাতাওয়া আল-হামিদিয়্যা ২/১৩৭, রাসাইলে ইবনে আবিদীন ১/১৫৭, ১৬১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৮৫)

(গ) যদি নিজ মহল্লায় অথবা আশপাশে নিকটস্থ এমন কোন মসজিদ পাওয়া না যায় যেখানে বিনিময় নেয়া ছাড়া তারাবীহ পড়ানো হয়, তাহলে এমতাবস্থায় একাকী আদায় না করে কয়েকজন মিলে সূরা তারাবীহর ব্যবস্থা করে জামাআতের সাথে পড়া উচিত। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৮৫

(ঘ) যেহেতু এ ধরনের সুরতে হাফেয সাহেবকে দিয়ে ইমামতি করানো উদ্দেশ্য হয় না; বরং মূল উদ্দেশ্য থাকে খতমে তারাবীহ, তাই তা বৈধ হবে না। তবে যখন শুধু ইমামতিই উদ্দেশ্য হবে, তারাবীহ না পড়ালেও নির্ধারিত বেতন প্রদান করা হবে তখন জায়েয হবে। অন্যথায় এটা শুধু একটি বাহানা। আর দিয়ানতের মধ্যে হিলা বা বাহানা দ্বারা কোন হারাম বিষয় হালাল হয় না।

মুতাআখখিরীন উলামায়ে কেরাম দীনের হিফাযতের স্বার্থে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কিছু শি'আর অর্থাৎ তা'লীম, ইমামত, আযান-ইকামত ইত্যাদির ক্ষেত্রে দীনের স্বার্থে বিনিময় প্রদান ও গ্রহণ করাকে বৈধ বলেছেন। এগুলো ছাড়া অন্য সকল ইবাদতের মধ্যে পূর্বের হুকুম (বিনিময় গ্রহণ করা হারাম) বহাল থাকবে।

আর তৃতীয় সুরতে যেহেতু মসজিদের নিয়মিত স্টাফদের স্বাভাবিক বেতন বোনাসের চেয়ে বেশি প্রদান করা হয়, আর যারা তারাবীহ পড়ান না তাদেরকে অতিরিক্ত বোনাস দেয়া হয় না, এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের মূল উদ্দেশ্য ইমামতি নয়; বরং তারাবীহর বিনিময় দেয়া। কাজেই এ হীলা সহীহ নয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/২৪৩, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৪১৬, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৭৭৪১, ৩০০০২, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৯৮৮৬, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৯১৭, ফাতাওয়া শামী ৬/৫৫, উমদাতুর রি'আয়া ৬/৫২৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৮৪)

ইঞ্জিনিয়র শেখ শামীমুল ইসলাম
টেকঢালীবাড়ী, ভাটারা, ঢাকা

২২০ প্রশ্ন : কারো যদি নফল রোযা রাখা অবস্থায় হায়েয এসে যায় তাহলে কি ফরয রোযার মত ঐ রোযারও কাযা আদায় করতে হবে?

উত্তর : নফল রোযা শুরু করার পর যদি কোন কারণে সে রোযা ভেঙ্গে যায়, তাহলে সে রোযার কাযা আবশ্যক। চাই ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙ্গে ফেলুক অথবা অনিচ্ছায় (যেমন হায়েয শুরু হওয়ার দরুন)। সুতরাং হায়েয আসার কারণে নফল রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার সুরতে উক্ত রোযার কাযা করা সংশ্লিষ্ট মহিলার জন্য আবশ্যক। (ফাতাওয়া শামী ২/৪২৮, আল-বাহরুর রায়িক ২/৫০৩, আল-মউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ২৮/৯৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৩৮)

আবূ আহমাদ মাইমুন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

২২১ প্রশ্ন : (ক) ধনী ব্যক্তির নাবালেগ বাচ্চাকে যাকাত-ফিতরা দেয়ার বিধান কি?

(খ) যাকাত-ফিতরা বা ফিদয়ার মাল মালিক বানানোর পর ধনী লোকেরা খেতে পারবে কি?

উত্তর : (ক) ধনী ব্যক্তির নাবালেগ সন্তানকে যাকাত-ফিতরা বা ওয়াজিব দান সদকা দেয়া যাবে না। কেননা শরীয়তে ধনী লোকের নাবালেগ বাচ্চাকে পিতার ধনাঢ্যতার কারণে ধনী হিসেবেই গণ্য করা হয়। তবে ধনী লোকের বালেগ সন্তানকে যাকাত-ফিতরা দেয়া যাবে, যদি তার নিসাব পরিমাণ নিজস্ব সম্পত্তি না থাকে। তেমনিভাবে মা যদি ধনী হয় কিন্তু বাবা ধনী না হয়, তাহলে তার নাবালেগ সন্তানকেও যাকাত-ফিতরা দেয়া যাবে।

(খ) যাকাত-ফিতরা বা ওয়াজিব সদকার মাল কাউকে মালিক বানানোর পর তার মধ্যে আর যাকাত-ফিতরার হুকুম বাকি থাকে না। কাজেই অন্য কোন বাধা না থাকলে ধনী ব্যক্তিও তা খেতে পারবে। (সূরা তাওবা- ৬০, সহীহ বুখারী; হা.নং ২৫৭৮, ফাতাওয়া শামী ২/৩৪৯, ৬/১১৬, আল-বাহরুর রায়িক ২/৪২৮, তাবয়ীনুল হাকায়িক ২/১২৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/১৯৯, ফাতাওয়া কাযীখান ১/২৬৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৮)

মুহাম্মাদ তাওহীদুল ইসলাম
শিক্ষার্থী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

২২২ প্রশ্ন : আমাদের দেশে দোকান ভাড়া নেয়ার পর যে টাকা অ্যাডভান্স দেয়া হয় সেই টাকা দোকানের মালিক খরচ করতে পারবে কিনা এবং সেই টাকার উপর যাকাত আসবে কিনা? যদি যাকাত আসে তাহলে কার উপর আসবে?

উত্তর : বর্তমানে আমাদের দেশে দোকান, বাড়ি, ফ্ল্যাট ইত্যাদি ভাড়া নেয়ার ক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতিতে অ্যাডভান্সের টাকা আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

(১) অফেরতযোগ্য অ্যাডভান্স, যা থেকে দোকান বা বাড়ির মালিক চুক্তি অনুযায়ী প্রতি মাসে ভাড়া হিসেবে নির্ধারিত পরিমাণ কেটে নিয়ে থাকে। এর বিধান হল, দোকানের মালিক উক্ত টাকা গ্রহণ করার পর সে পূর্ণ মালিক হয়ে যায়। তাই মালিক নিজস্ব প্রয়োজনে উক্ত টাকা খরচ করতে পারবে এবং বছরান্তে এ টাকা অবশিষ্ট থাকলে অন্যান্য সম্পদের ন্যায় ঐ মালিকের উপর এ টাকারও যাকাত আসবে।

(২) ফেরতযোগ্য অ্যাডভান্স যা ভাড়া হিসেবে কেটে নেয়া হয় না। বরং দোকানের মালিকের নিকট জামানত হিসেবে জমা থাকে এবং ভাড়াচুক্তির মেয়াদ শেষে উক্ত টাকা ভাড়াটিয়াকে ফেরত দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে অ্যাডভান্সদাতা অর্থাৎ ভাড়াটিয়াই এ টাকার পূর্ণ মালিক থাকে। তাই এ টাকার যাকাত তারই উপরে আসবে এবং এ টাকা হস্তগত হওয়ার পর বিগত বছরগুলোর যাকাতও আদায় করতে হবে। (সূরা বাকারা- ২৭৭, সহীহ বুখারী; হা.নং ১৩৯৭, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৪৬, আল-মাবসূত ২/১৯৬)

আবিদ হুসাইন
শ্যামলী, ঢাকা

২২৩ প্রশ্ন : (ক) আমার বিগত কয়েক বছরের যাকাত আদায় করা হয়নি। আমার যাকাতের মাল হল স্বর্ণ ও টাকা। জানার বিষয় হল, বিগত বছরগুলোর যাকাত কোন মূল্য হিসেবে আদায় করব? বর্তমান বাজারমূল্য হিসেবে, নাকি পূর্বের বছরগুলোর মূল্য হিসেবে?

(খ) আমি এক বছরের যাকাত আদায় করেছি, তবে কিছু বেশি আদায় করেছি। এই অতিরিক্ত আদায়কৃত টাকাগুলো পূর্বের বছরগুলোর বকেয়া যাকাত থেকে আদায় হবে কিনা?

উত্তর : (ক) আপনার বিগত বছরের অনাদায়ী যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় তথা পূর্বের বছরগুলোর মূল্য হিসেবে আদায় করতে হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/২৮৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৮, ফিকহুয যাকাত; পৃষ্ঠা ২৩৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২৬৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৫৩৬)

(খ) আপনি অতিরিক্ত টাকাগুলোও যেহেতু যাকাতের নিয়তেই প্রদান করেছেন, তাই সে টাকাগুলো বিগত বছরের অনাদায়ী যাকাতের সঙ্গে সমন্বয় করতে পারবেন। (আল-হিদায়া ১/১৮৮, আল-বাহরুর রায়িক ১/৩৬৮, ফাতাওয়া শামী ২/১৬৯-১৭০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৮৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৩৮৩)

আব্দুস সামাদ
খুলনা

২২৪ প্রশ্ন : (ক) আমাদের গ্রামে প্রথমে একটি ছোট মসজিদ ছিল। মুসল্লীর আধিক্যের কারণে গ্রামে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করি। এখন উভয় মসজিদে জুমু'আর নামায চালু আছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা প্রথম মসজিদটি বড় আকারে নির্মাণ করেছি আলহামদুলিল্লাহ। জানার বিষয় হল, গ্রামের দ্বিতীয় মসজিদে শুধুমাত্র জুমু'আর নামায স্থগিত রেখে প্রথম মসজিদে সকলেই একসঙ্গে জুমু'আ আদায় করতে পারব কিনা?

(খ) আমার নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর যাকাত আদায় করা হয়নি। অনাদায়ী যাকাতের টাকা বাদ দিলে এ বছর আমার কাছে নিসাব পরিমাণ টাকা অবশিষ্ট থাকে না। জানার বিষয় হল, এ অবস্থায় আমার উপর যাকাত ওয়াজিব কিনা?

উত্তর : (ক) প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে দ্বিতীয় মসজিদে জুমু'আর নামায স্থগিত রেখে বড় মসজিদে সকলে একসঙ্গে জুমু'আ আদায় করতে পারবেন। তবে দ্বিতীয় মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায চালু রাখতে হবে। যেন সে মসজিদটিও আবাদ থাকে। (সূরা বাকারা- ১১৪, তাফসীরে কাবীর ৪/১২, তাফসীরে বাইযাবী ১/১০১, তাফসীরে কুরতুবী ২/৭৭-৭৮, আল-বাহরুর রায়িক ৫/৪১৯, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯/৯০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২১/৩২৬)

(খ) প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে প্রথমে আপনার উপর বিগত বছরের যাকাত দেয়া ওয়াজিব। এরপর যদি আপনার নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে তাহলে এ বছর আপনার উপর যাকাত দেয়া ওয়াজিব হবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/২৬০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৭৪-৭৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/১৫২)

লিয়াকত খান
ধানমন্ডি, ঢাকা

২২৫ প্রশ্ন : রমাযান মাসে কিয়ামুল লাইলের জামাআত করার বিধান কি? যদি কোন মসজিদ কমিটি ঘোষণা দিয়ে রমাযান মাসে কিয়ামুল লাইলের জামাআতের আয়োজন করে তবে এক্ষেত্রে মুসল্লীদের করণীয় কি? এতে কর্তৃপক্ষের গুনাহ হবে কিনা? কেউ কেউ হারামাইন শরীফাইনের কিয়ামুল লাইলের জামাআতকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন যে, সেখানে হতে পারলে আমাদের এখানে হতে সমস্যা কোথায়? দলীল-প্রমাণের আলোকে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : কিয়ামুল লাইলের নামায নফল। আর নফল নামায জামাআতের সাথে আদায় করা মাকরূহ। চাই রমাযান মাসে হোক বা অন্য যে কোন মাসে হোক।

যদি কোন মসজিদ কমিটি ঘোষণা দিয়ে রমাযান মাসে কিয়ামুল লাইলের জামাআতের আয়োজন করে তবে এক্ষেত্রে মুসল্লীদের করণীয় হল, তারা জামাআতের সাথে কিয়ামুল লাইল আদায় করা থেকে বিরত থাকবে।

আর হারামাইন শরীফাইনের অধিকাংশ ইমাম হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী।

হাম্বলী মাযহাব মতে জামাআতের সাথে কিয়ামুল লাইল আদায় করা মাকরূহ নয়। কিন্তু একজন হানাফী মুসল্লীর জন্য শরীয়ত স্বীকৃত কারণ ছাড়া কোন মাসআলায় নিজ মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাব অনুসরণের অবকাশ নেই। কেননা অমুজতাহিদ ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত মুজতাহিদের অনুসরণ করা জরুরী। অমুজতাহিদের মাযহাব অনুসরণ না করা বা যখন খুশি মাযহাব পরিবর্তন করার অর্থ হল, শরীয়ত বাদ দিয়ে নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করা। কুরআন-সুন্নাহর বিধান মতে খেয়াল-খুশির অনুসরণ নাজায়েয ও ভ্রষ্টতা। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১১৬, ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ১/২৯, ফাতাওয়া শামী ১/৪৫৬, ২/৪৮, বাদায়িউস সানায়ি ১/২৯০, আল-বাহরুর রায়িক ২/৭৪, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৬৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৮৬, ফাতাওয়া রশীদিয়া; পৃষ্ঠা ৩৪০, ৩৫৫, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪/১৩৬, আল-মুগনী ২/১০৪, আল-ইকনা' ফী ফিকহিল ইমাম আহমাদ ইবনি হাম্বাল ১/১৫২)

মুহাম্মাদ মুনীরুজ্জামান
কমলাপুর, পাইকগাছা, খুলনা

২২৬ প্রশ্ন : যাকাতের টাকা দ্বারা এতীম ও গরীব ছাত্রদের ছাত্রাবাস নির্মাণ ও জমি ক্রয় বা উপযুক্ত হকদারদের কল্যাণে ব্যবহার করা যাবে কিনা?
উল্লেখ্য, সেখানে যাকাত প্রদানকারীর কোন ফায়দা থাকবে না।

উত্তর : যাকাতের টাকা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত এতীম ও গরীব ছাত্রদের সরাসরি প্রয়োজনে ব্যয় করতে হবে এবং তাদেরকে ঐ মালের নিঃশর্ত মালিক বানিয়ে দিতে হবে। ছাত্রাবাস নির্মাণ ও জমি ক্রয় বা এ জাতীয় কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না। যদিও তাতে যাকাত প্রদানকারীর কোন ফায়দা না থাকে। (সূরা তাওবা- ৬০, ফাতহুল কাদীর ২/২০৮, উমদাতুর রি'আয়া ২/৪৭৫, ফাতাওয়া শামী ২/৩৪৪)

মাহমুদ বিন মাহমুদ
নারায়ণগঞ্জ

২২৭ প্রশ্ন : (ক) আমি আগে জানতাম না যে, শেয়ার ব্যবসা হারাম। এখন তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে জানতে পেরেছি। কিন্তু এখন এমন লোকসানে আছি যে, যে দামে শেয়ার ক্রয় করেছি সে দামও আসছে না। তাই কিছু শেয়ার লাভে বিক্রি করে বের হয়ে আসতে চাই। (আল্লাহ চাহে তো এর পরে আর কোন দিন শেয়ার ব্যবসায় জড়িত হব না) কিন্তু যে ক'দিন থাকতে চাচ্ছি সে ক'দিন গুনাহ হবে তা-ও জানি। আর আমার এমন কোন মাধ্যমও নেই, যার দ্বারা আমি শেয়ারের লোকসান কাটিয়ে উঠবো। এখন আমার করণীয় কি?
শেয়ারের টাকার উপর যাকাত আসবে কিনা? যদি যাকাত আসে তাহলে তার হিসাব কিভাবে হবে?

(খ) বর্তমানে বিভিন্ন ক্রোকারিজের দোকানে ও বাণিজ্য মেলায় এমন সব বাসনপত্র পাওয়া যায় যেগুলো দেখতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি বাসনপত্রের সাদৃশ্য রাখে। এখন জানার বিষয় হল, এ ধরনের বাসনপত্র ব্যবহারের বিধান কি?

(গ) আমাদের দেশে বহু ইহুদী, খ্রিস্টান ও হিন্দু রাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানী হচ্ছে এবং ইহুদী-খ্রিস্টান পরিচালিত বহু কোম্পানীর পণ্য বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এখন জানার বিষয় হল, এসব পণ্যে যে হালাল শব্দ লেখা দেখা যায় এর দ্বারা কি পণ্য হালাল হয়ে যাবে? বিস্তারিত জানালে খুশি হব।

উত্তর : (ক) বর্তমান প্রচলিত শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও হারাম। কারণ প্রচলিত শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় এটি এক ধরনের জুয়ায় পরিণত হয়েছে।
এছাড়া শেয়ার বাজারের প্রায় সব ক'টি কোম্পানী সুদী কারবারে জড়িত রয়েছে। সুতরাং আপনার কাছে যে শেয়ারগুলো রয়েছে সেগুলোর শেয়ার বাজার মূল্য কোম্পানীর 'নীট অ্যাসেট ভ্যালু'র সমপরিমাণ হলেই বিক্রয় করে এ ব্যবসা থেকে দ্রুত বের হয়ে পড়বেন। এতে যদি আর্থিক ক্ষতি হয় তাহলে পরকালের দিকে চেয়ে সেই ক্ষতি মেনে নিবেন।
হাদীস শরীফে এসেছে, মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যখন সম্পদ উপার্জনে এ মর্মে কোন তোয়াক্কা করবে না যে, সে হালাল উপার্জন করছে, নাকি হারাম উপার্জন করছে। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এদের অনেককেই মুখ না সামলানো (হারাম ভক্ষণ) এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত না করার কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, হারাম খাদ্যে লালিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন, যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, আল্লাহ তা'আলা তার নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই; আল্লাহ সবকিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা ও মেয়াদ স্থির করেছেন। সুতরাং চিরস্থায়ী পরকালের শান্তির প্রত্যাশী কোন মুসলমান ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রাচুর্যের লোভে আখেরাতের শাস্তির ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারে না।
তাছাড়া এ ব্যবসায় লোকসান কাটিয়ে উঠারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই। আপনি অন্য কোন হালাল পন্থায় অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করুন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলা তাতে বরকত দান করবেন।
যারা ভুলক্রমে শেয়ার ব্যবসায় জড়িয়ে গেছে তারা শেয়ারের বাজার মূল্য হিসাবে যাকাত দিয়ে দিবে। (সূরা মায়িদা- ৯০, সূরা বাকারা- ২৭৫, সূরা তালাক- ২, ৩, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২০০৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা; হা.নং ৮৪, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হা.নং ১০৭৯১, মু'জামুত তাবারানী কাবীর; হা.নং ১৪৭১১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২৬১৭১, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৫১৩, উমদাতুল কারী ১১/২৬৪, ফাতাওয়া শামী ২/২৭৩, ৫/৬৫, ৬৪৫, ৬৪৬, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ২০/১৯০, কিতাবুল ফাতাওয়া ৩/২৬৮, ইসলাম কী মা'আশী নিযাম ৭/২১৮-২১৯)

(খ) শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা তৈরি পাত্র ব্যবহার করা হারাম। প্রশ্নে উল্লিখিত বাসনপত্র যেগুলো দেখতে স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরি বাসনপত্রের সাথে সাদৃশ্য রাখে, সেগুলোতে যদি স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়া অন্য কোন পদার্থ প্রলেপ দেয়া থাকে তাহলে সেগুলো ব্যবহার করতে কোন সমস্যা নেই। (সহীহ বুখারী ৭/১১৩, ফাতাওয়া শামী ৬/৩৪৩, ৩৪৪, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৬/৫৪, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ২৪/৪১০)

(গ) যে সমস্ত পণ্যের গায়ে হালাল লেখা দেখা যায় এবং সেগুলো হারাম হওয়ার কোন কারণ শনাক্ত করা না যায়, তাহলে সেগুলো হালাল হিসেবে গণ্য হবে।
উল্লেখ্য, বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। কারণ আজকাল অনেক কাফের কোম্পানীও তাদের তৈরি পণ্যে 'হালাল' লিখে দেয়। অথচ হালাল-হারাম সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই। সুতরাং সাধ্যমত যাচাই-বাছাই করতে চেষ্টা করবে। শুধু ঐ লেখার উপর ভরসা করবে না। (আহকামুল মালিল মুখতালাত; পৃষ্ঠা ১২৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩১০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/৬৬)

আমি ছুটি কিভাবে কাটাবো?

মুফতী শফীকুর রহমান টাঙ্গাইলী

ফুরসত, অবসর, অবকাশ, নিষ্কৃতি ইত্যাদিসহ অভিধানে ছুটির অনেক অর্থ লেখা হয়েছে। কিন্তু যে ছেলেটি ইলমে ওহীর তালিব, কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান সমুদ্র থেকে নিজের কোঁচড় ভরে নিচ্ছে। তার তো উক্ত অর্থে কোন ছুটিই নেই; বরং প্রতিটি শব্দ বৃদ্ধির সাথে সাথে তার দায়িত্বের পরিধি প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। পথহারা সমাজকে আলোর পথ দেখানোর যিম্মাদারী তার কর্তব্যে পরিণত হচ্ছে। তাই ছাত্রদের ক্ষেত্রে প্রচলিত ছুটিকে ছুটি বলা চলে না। বেশির চেয়ে বেশি কাজের ক্ষেত্র পরিবর্তন হয়েছে বলা যেতে পারে। প্রবাদ আছে, كل جديد لذيذ 'প্রত্যেক নতুনে নতুন স্বাদ'। দীর্ঘ একঘেয়ে রুটিন থেকে রেহাই লাভের জন্য ছুটির আয়োজন। এ সময় শিক্ষাক্ষেত্রের আনুষঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চর্চা, আহরিত জ্ঞানের প্রসারসহ অনেক কিছুই আঞ্জাম দেয়া যায়। হেলায় ফেলায় কাটানোর জন্য ছুটির এ ব্যবস্থা নয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ.

অর্থ : অধিকাংশ মানুষ দু'টি নেয়ামতের ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ে আছে। সুস্থতা ও অবসরতা। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৪১২)

হাদীসে বর্ণিত ধোঁকায় থাকার অর্থ হল, যে ব্যক্তি শারীরিক রোগ-ব্যধি থেকে সুস্থ, কাজ-কর্মের ব্যস্ততা থেকে মুক্ত, এরপরও সে তার আখেরাতের কল্যাণে কাজ করল না, সে কেমন যেন ক্রয়-বিক্রয় লোকসানে পড়া ব্যক্তির মত হয়ে গেল। (কীমাতুয যামান; পৃষ্ঠা ৩৬)

অন্য হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

اغتنم خمسا قبل خمس ... وفراغك قبل شغلك.

অর্থ : তুমি পাঁচটি জিনিসকে অপর পাঁচটি জিনিস আসার আগেই মূল্যায়ন করো, গনীমত মনে করো। ... ব্যস্ততা আসার আগে অবসরকে। (সুনানে কুবরা লিলবাইহাকী; হা.নং ১১৮৩২)

এমনকি এক হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, মুমিন কাজে-কর্মে এতটাই ব্যস্ত থাকবে যে, ব্যস্ততার ঘামের মধ্যেই তার মৃত্যু চলে আসবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يموت المؤمن بعرق الجبين.

অর্থ : মুমিন মৃত্যুবরণ করে কপালের ঘাম নিয়ে। (সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৩০১১)

সুতরাং আমাদের সর্বপ্রথম ছুটিকে কাজে লাগানোর মানসিকতা তৈরি করতে হবে। অতঃপর আগত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে।

১. নিজেকে প্রস্তুত করা।
২. পরিবার ও সমাজের খিদমত করা।

নিজেকে প্রস্তুত করা

আজকে আমি ছাত্র। কিন্তু আগামী দিন আমি হবো সমাজ সেবক। দীনের খাদেম, দা'য়ী। সুতরাং দক্ষতার সাথে দীনের খিদমত করতে হলে, সমাজ সেবা করতে হলে, নিজেকে চতুর্মুখী যোগ্যতার সমাহার বানাতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন-

ক. ইলমী যোগ্যতা
খ. কর্ম দক্ষতা
গ. আচরণ দক্ষতা

ইলমী যোগ্যতা : আমাদের মাদরাসাগুলোতে দরসিয়াতে যে সকল কিতাবের পাঠদান করা হয় সেগুলো মূলত মৌলিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য। অভিজ্ঞ আলেম হওয়ার জন্য এগুলোই যথেষ্ট নয়। বরং যোগ্যতা সম্পন্ন অভিজ্ঞ আলেম হওয়ার জন্য প্রত্যেক তালিবে ইলমের নিজ তা'লীমী মুরুব্বীর সাথে পরামর্শ করে নিসাব বহির্ভূত জরুরী কিতাবের বিষয় ভিত্তিক একটি তালিকা করে নেয়া উচিত এবং সেখান থেকে কোন্ কিতাব কখন পড়বে তার জন্য একটি নিযামুল আওকাত (সময়সূচী)-ও প্রস্তুত করে নেয়া বাঞ্ছনীয়। কোনটা নির্ধারণ করবে আসরের পরের জন্য, কোনটা শুক্রবারের জন্য, আবার কোনটা ছুটির দিনগুলোর জন্য। ছুটির দিনগুলোরও একটি নেযামুল আওকাত তৈরি করে নিবে। উদাহরণস্বরূপ ফজরের পর তিলাওয়াত, নাস্তা ও দুই/এক ঘণ্টা ঘুমের পর গাইরে দরসী আহাম আহাম কিতাবগুলো পড়বে, যোহরের পর খাওয়া-দাওয়া সেরে তুলনামূলক সহজ কিতাব বা শিক্ষণীয় ঘটনার কিতাব পড়বে। মাগরিবের পর দরসিয়াতের যেসব জায়গায় কাঁচা রয়ে গেছে, সেটা পড়বে। অথবা আগামী বছরে পঠিতব্য কিতাবগুলোকে অগ্রীম মুতালাআ করে সেগুলোর সাথে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করে নিবে।

ছুটিতে মুতালাআ করার মত বিষয়ভিত্তিক গাইরে দরসী জরুরী কিতাবের সংক্ষিপ্ত নমুনা তালিকা নিম্নরূপ-

১. তাফসীর ও উলূমুল কুরআন : বয়ানুল কুরআন, তাফসীরে উসমানী, মা'আরিফুল কুরআন, তাওযীহুল কুরআন, সফওয়াতুত তাফাসীর, উলূমুল কুরআন, আল-ইসরাঈলিয়াত ওয়াল-মাউযূ'আত।

২. হাদীস : রিয়াযুস সালিহীন, মা'আরিফুল হাদীস, আল-আরবাউনান্নাবাবিয়্যাহ, ছোটদের সহীহ হাদীস (হাদীসের আলো), এসব হাদীস নয় (প্রচলিত জাল হাদীস)।

৩. উলূমুল হাদীস : মুকাদ্দামাতুশ শাইখ (মিশকাত শরীফের শুরুতে সংযুক্ত), তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস, আল-মাদখাল ইলা উলূমিল হাদীস।

৪. সীরাত : শামাইলে তিরমিযী, আসাহ্হুস সিয়ার, সীরাতুন্নবী, সীরাতে মুস্তফা, নবীয়ে রহমত, ছোটদের সীরাত সিরিজ, হায়াতুস সাহাবা।

৫. ফিকহ : বেহেশতী জেওর, ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া, জাওয়াহিরুল ফিকহ, আহকামে মাইয়েত, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল, নির্ভরযোগ্য দীনী পত্রিকাগুলোর সুওয়াল-জওয়াব বিভাগ।

৬. তারীখ : তারীখুল ইসলাম (আকবর শাহ নাজীবাবাদী কৃত), তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত, আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম, উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী, ইসলামী খেলাফত ধ্বংসের প্রকৃত ইতিহাস, ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুআবিয়া রাযি., ভুল সংশোধন, আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে, বুযুর্গানে দীনের জীবনের উপর লেখা বিভিন্ন কিতাব।

৭. আদাবে ইসলামিয়া : উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সা., আল-আদাবুল মুফরাদ, মিন আদাবিল ইসলাম, আদাবুদ্দুনইয়া ওয়াদ্দীন, আদাবুল মু'আশারাত, সুখময় জীবনের সন্ধানে।

৮. মালফূযাত : মাজালিসে আবরার, কামালাতে আশরাফিয়া, মালফূযাতে মুজাদ্দিদে দ্বীন, মালফূযাতে মুফতী আ'যম (মুফতী শফী রহ.), বাসাইরে হাকীমুল উম্মত, আনফাসে ঈসা, মালফূযাতে ইলয়াস রহ., হায়াতে মুহাদ্দিস রহ., আশরাফ চরিত, হযরত হাফেজ্জী রহ. স্মারক গ্রন্থ।

৯. ফিরাকে বাতেলা : মাওলানা হেমায়েতুদ্দীন ছাহেব কৃত ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, মুফতী মনসূরুল হক ছাহেব কৃত কিতাবুল ঈমান, মাযহাব কি ও কেন?, তুহফাতুল হাদীস, হাদিয়া আহলুল হাদীস।

১০. শিক্ষণীয় গল্প : মুসলমানের হাসি, চমৎকার ঘটনাবলী (থানবী রহ.), সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, সুওয়ারুম মিন হায়াতিত তাবিঈন, নির্বাচিত গল্প সংকলন, হৃদয় ছোঁয়া কাহিনী, মন মাতানো ঘটনা, তরবিয়াতী ওয়াকিয়াত।

কর্ম দক্ষতা : একজন বিচক্ষণ ছাত্রের জন্য যে কোন সময় যে কোন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং স্থান, কাল, পাত্র ভেদে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অগ্রীম প্রস্তুতি নিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। উদাহরণস্বরূপ, ছুটিতে বাড়িতে বা কোথাও গেলে হয়তো আমাকে ইমামতী করা লাগতে পারে, এজন্য আগে থেকেই ফজর, মাগরিব, ইশা, জুমু'আ ও ঈদের নামাযের যাবতীয় নিয়ম-কানুন যবত করে রাখা। বিশেষ করে কিরাআতের বিশেষ কিছু জায়গা ভালোভাবে ইয়াদ করে রাখা। যাতে নামাযে দাঁড়ালে আটকে পড়ার আশঙ্কা না থাকে। জুমু'আর নামায ও ঈদের নামাযের জন্য কমপক্ষে দু'টি খুতবা মুখস্থ করা ও বয়ান প্রস্তুত করে রাখা। আশেপাশে কোথাও অনুষ্ঠান, মাহফিল বা তাবলীগের বয়ানে হয়তো আমাকে বয়ান করা লাগতে পারে এজন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখা ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার কাজ। তেমনিভাবে মাইয়েতের গোসল, কাফন ও দাফনের সুন্নাত তরীকা জেনে রাখাও জরুরী কাজ।

আচরণ দক্ষতা : একজন মানুষের যতই ইলমী যোগ্যতা ও কর্ম দক্ষতা থাকুক, তার যদি আচার-ব্যবহার খারাপ থাকে– বদমেজাযী হয়, তাহলে তার যোগ্যতা, দক্ষতা কোন কাজে আসে না। মানুষ তার কথা শোনে না। তার কথার তাসীর হয় না। বরং সকলেই তার কাছ থেকে কেটে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.

অর্থ : আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। (সূরা আলে ইমরান- ১৬০)

এজন্য প্রত্যেক তালিবে ইলমের জন্য আচরণবিধি শিক্ষা করা, নববী আদর্শে আদর্শবান হওয়া, অনুপম চরিত্রের অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে আমরা মনে করি প্রত্যেক তালিবে ইলম বরং প্রত্যেক মানুষের জন্য ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরেফী কৃত 'ইস্তামতি বিহায়াতিক' (সুখময় জীবনের সন্ধানে) বইটি বারবার পাঠ করা অপরিহার্য।

পরিবার ও সমাজের খিদমত

একজন তালিবে ইলম যখন ছুটিতে বাড়ি বা অন্য কোথাও যায় তখন সে যেন সাময়িকের জন্য ফারেগ হয়ে কর্মের ময়দানে যোগদান করল। সুতরাং তার মধ্যে খিদমতের মানসিকতা থাকতে হবে। পূর্বে উল্লিখিত চতুর্মুখী যোগ্যতার মাধ্যমে ইখলাসের সাথে সমাজে অবদান রাখতে হবে।

নিজের খিদমত : قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. এই আয়াত অনুযায়ী প্রথমে নিজের ফিকির করতে হবে। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে নিজেকে ভুলে গেলে চলবে না। ঠিকমত জামাআতের সাথে নামাযের পাবন্দি করা, দৈনিক কমপক্ষে তিন পারা কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা, মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা, খারাপ পরিবেশ থেকে দূরে থাকা, পাড়ার বখাটে বা দুষ্টু ছেলেদের সাথে না মেশা বা তাদের সাথে খেলাধুলা না করা এবং বিভিন্ন হালত দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। বরং তাদেরকে দীনের পথে আনতে চেষ্টা করা।

মাতা-পিতার খিদমত : আমাদের প্রত্যেকের জীবনে মাতা-পিতার ত্যাগ-কুরবানী ও দান-অবদান অপরিসীম। তাই কুরআন মাজীদে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের সামনে উফ পর্যন্ত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. [الإسراء : ٢٣، ٢٤]

দুনিয়া ও আখেরাতে বড় হওয়ার জন্য, ইলম হাসিলের জন্য আব্বা-আম্মার সন্তুষ্টি ও দু'আ অপরিহার্য। এজন্য সাধ্যমত আব্বা-আম্মার খিদমত করবে। আম্মাকে ঘরের কাজে সাহায্য করবে। আব্বাকে বাইরের কাজে সহযোগিতা করবে। মসজিদে যাওয়ার সময় সাথে করে নিয়ে যাবে। তাদের থেকে কালিমা, সূরা-কিরাআত ও নামাযের মাসআলা-মাসাইল, দু'আ-দুরূদ শুনবে ও শুনাবে, নামায শিখাবে।

আত্মীয়-স্বজনের খিদমত : আল্লাহকে রাজি-খুশি করার নিয়তে নিকটাত্মীয়দের সাথে সাক্ষাত করবে। আচার-ব্যবহারে তাদের প্রতি মহব্বত প্রকাশ করবে। মুরুব্বী আত্মীয়দের তা'যীম করবে। ছোট আত্মীয়দের আদর করবে। প্রয়োজনে ছোট-খাটো হাদিয়া দিবে। এতে সবাই খুশি থাকবে।

সমাজের খিদমত : উলামায়ে কেরাম জাতির কাণ্ডারী, সমাজের যিম্মাদার– নেতা। আর যে নেতা হয় তার খিদমত করতে হয়। সুখে-দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়। যে খিদমত করে সেই নেতা হয়। سيد القوم خادمهم। সুতরাং প্রত্যেক তালিবে ইলমকে কওমের খাদেম হতে হবে। তাছাড়া এটা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সুন্নাতও বটে। তালিবানে ইলম তিনভাবে সমাজের খিদমত করবে-

ক. শারীরিকভাবে

খ. আর্থিকভাবে

গ. ধর্মীয় দিক দিয়ে

ক. শারীরিকভাবে খিদমত

পাশের বাড়ির চাচী আম্মার বাজার করার কেউ নেই, আমি তাকে বাজার করে দেই। নানা ভাই দুর্বল– অসুস্থ; মসজিদে যেতে পারেন না, তাকে হাত ধরে মসজিদে নিয়ে যাই, মসজিদ থেকে বাড়িতে নিয়ে আসি। চাচাত ভাই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে আমি ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে নিয়ে যাই। এতে আমার কোন টাকা-পয়সা লাগবে না। কিন্তু আমার ইলমের মধ্যে নূর আসবে। তারা আমার জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করবে। আমার দীনী কথা অন্তর দিয়ে শুনবে। প্রয়োজনে তারা আমার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না।

খ. আর্থিকভাবে খিদমত

الانسان عبد الاحسان (মানুষ অনুগ্রহের দাস)। আমি যদি সমাজে অবদান রাখতে পারি, তাদের জন্য আমার সামর্থ্যানুযায়ী খরচ করতে পারি, বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, অসহায়-দুর্বলদের সাহায্য করতে পারি,তাহলে সমাজের মানুষ আমার হয়ে যাবে। **(২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

সোজাসাপ্টা

অমঙ্গল শোভাযাত্রা

আবূ তোরাব মা'সূম

এক. ইসলাম আমাদেরকে যেসব উৎসব উপহার দিয়েছে, সেগুলোই ঠিকমতো উদযাপন করা হচ্ছে না। মঙ্গল শোভাযাত্রা, থার্টিফার্স্ট নাইট, ঈদে মীলাদুন্নবী ইত্যাদি নিয়ে ভাবার সুযোগ কোথায়?

যুগটা বড় স্পর্শকাতর। এ যুগে মন্দ নিয়ে বেশি ভাবতে গেলে, যেখানে সেখানে তর্কে জড়াতে গেলে নিজেরই মন্দে জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তারচে' তর্কবিতর্ক যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

তবে হ্যাঁ, মুহতারাম খতীব সাহেবরা এ নিয়ে বলতে থাকবেন। কারণ তাঁদের বলাতে সাধারণত তর্ক সৃষ্টি হয় না। তারা একতরফা বলে-কয়ে 'ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ' দিয়ে শেষ করে উঠে আসতে পারবেন। আরো যাঁদের প্রতাপ আছে, কিছু বললে মানুষ মাথা নত করে শোনে, যাঁদের কথায় মানুষ প্রমাণ ছাড়াই আস্থা রাখে, সে সকল প্রথিতযশারাও বলতে পারেন। তাহলে তর্ক কম হবে। কিছু বেশি ফায়দা হবে। নতুবা আমাদের মতো সাধারণের জন্য লোকাল বাসে ঘামে ভিজে, পাবলিক টয়লেটের সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে, লঞ্চের ডেকে বসে গায়েপড়া পাবলিকের সাথে মঙ্গল শোভাযাত্রা 'সংস্কৃতি নাকি অপসংস্কৃতি' এ নিয়ে তর্ক করাটা পরিণামে অপমানিত হওয়া ও সময় নষ্ট ছাড়া ভালো কিছু বয়ে আনে না। অধিকাংশ তর্কবাজেরই সত্যের অনুসন্ধিৎসা থাকে না। তাই তর্কে তর্ক বাড়ে। হাতাহাতি ও প্রতিহিংসার দুয়ার খোলে। আমাদের মতো সাধারণের জন্য নিজেকে ওসব থেকে বাঁচিয়ে রাখা, দু'আ করা এবং তর্কাতর্কি এড়িয়ে চলাটাও ছোট পর্যায়ের প্রতিবাদ। তাছাড়া ভালো ও সরল কোন কথাকে জঙ্গিবাদ হিসেবে উপস্থাপন করে পুরনো কোন বোমাবাজির পেন্ডিং মামলা ঠুকে দেয় কিনা সেই ভয়ও থাকে। তবে কারো মাঝে যদি সত্যের অনুসন্ধিৎসা দেখা যায়, তখন দু'-চার কথা, এক-দু' খণ্ড ভাবনা বিনিময় করা যায়।

বাকি এই এড়িয়ে চলা ও চুপ থাকা কতোক্ষণ? যতোক্ষণ তারা অন্যায় ও অপকর্মের সীমা ছাড়াচ্ছে না এবং তাদের বিশ্বাস ও উৎসব আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে না। এই তো ঢাকেশ্বরী, আর.কে. মিশন রোড, জয়কালী এবং ঘাড়ের কাছের বাঁশবাড়িতে মানুষের ঘুম হারাম করে, পথঘাট বন্ধ করে চরম ভোগান্তি সৃষ্টি করে তিনদিন ব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসব পালিত হয়। এই তিন দিন ওরা ওদের যা খুশি করে। আমরা কি কিছু বলি? অথচ খুব কাছেই আমাদের মসজিদগুলোয় মুসল্লিদের ইবাদতের ধ্যানমগ্নতা ব্যাহত হচ্ছে। আসলে ওদের নিজ ধর্মের উৎসব ওরা যেভাবে খুশি করতে পারে। কিন্তু ভোগান্তি ও বিঘ্নতার পরিবেশ তো সৃষ্টি করতে পারে না! সেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিবাদেরও অধিকার থাকে। কিন্তু আমরা কি কোন প্রতিবাদ করছি? করছি না। বরং বিষয়টা মোটেই মাথায় না নিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তারা যদি কখনো সরকারকে দিয়ে এ মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করে যে, প্রতিটি বাঙালিকে দুর্গোৎসবে অংশগ্রহণ করতে হবে। তখন কি আর চুপ থাকা যাবে?

গুঞ্জন উঠেছে, গুঞ্জনই না কেবল, বরং এটাই বাস্তবতা যে, কিছু সেক্যুলার ও প্রগতিশীলের উল্লম্ফন ও আস্ফালনে বৈশাখিকে আবহমানকালের বাঙালি সংস্কৃতি বলে সরকার মঙ্গল শোভাযাত্রার মতো একটি হিন্দুয়ানী সংস্কৃতিকে সবার উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। যদিও এ ক্ষেত্রে প্রগতিশীলদের সাফল্য মেলা কঠিন। এমন যদি হয়, তাহলে এড়িয়ে যাওয়ার নীতি বর্জন করতেই হয়। যারা বলতেন, তারা আগের চেয়ে বেশি বলবেন। যারা কিছুই বলতেন না, তারা বলতে শুরু করবেন। বলা-কওয়ার এক অথৈ সমুদ্র সৃষ্টি হবে। সুনামি নয়; শান্ত সমুদ্র। কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে শান্তের মাঝেই বলিষ্ঠতা। এই বলা-কওয়ার শান্ত সমুদ্র সৃষ্টির চেতনা থেকেই কলম হাতে নেয়া। যাতে আমার এই লেখাটা সেই অথৈ সমুদ্রের একবিন্দু জল হতে পারে। কারণ বলা যায় না, আজ ওরা মঙ্গল শোভাযাত্রা চাপাতে চাচ্ছে, কাল যে দুর্গোৎসবকে আবহমানকালের বাঙালি সংস্কৃতি বলে আমাদের উপর চাপিয়ে দিবে না তার কী নিশ্চয়তা!!

দুই. একজন ভণ্ডপীরকে সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে তার নামের আগে-পরে কিছু কিম্ভুত বিশেষণ ও উপাধির ছন্নছাড়া ইশতিহারের প্রয়োজন হয়। তেমনি যে সংস্কৃতিটা সমাজে অপ ও ভণ্ড হিসেবে স্বীকৃত, জনমনে সেটার সিদ্ধতা প্রতিষ্ঠার জন্যও কিছু কিম্ভুত বিশেষণ ও উপাধির প্রয়োজন পড়বে এটাই স্বাভাবিক। 'আবহমানকাল', 'হিন্দু মুসলিম সবার জন্য', 'সর্বজনীন', 'বাঙালী সংস্কৃতি'– এই যে এতগুলো বিশেষণ মঙ্গল শোভাযাত্রার আগে পরে যুক্ত করছে প্রগতিশীলরা, এর একটাই মতলব; তা হল, মঙ্গল শোভাযাত্রা যে সংস্কৃতি হিসেবে অপ ও ভণ্ড তা আড়াল করা এবং সর্বসাধারণের চোখে ধুলো দেয়া।

আমি এই শব্দগুলোর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে যাচ্ছি না এখন। আপাতত আমার খেদ ভিন্ন জায়গায়। এই যে কথায় কথায় সর্বজনীনের প্রাদুর্ভাব! এই সর্বজনীনটা আসলে কী জিনিস! শুধু তাদেরটার বেলায়ই সর্বজনীন! আর আমাদের প্রসঙ্গ এলে মধ্যযুগীয়, বর্বর, মানবতাবিরোধী-সহ আরো কত কি? ব্যাপারটা এমন হয়ে গেল না– ভণ্ড গালি দিচ্ছে 'ভণ্ড' বলে, আর 'ধর ধর' বলে চোর মিশতে চাচ্ছে জনগণের সঙ্গে?

বস্তুত সার্বজনীনতা, বাঙালীত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদির ধুলোয় ও আবরণে যে ভৌগলিক সম্প্রীতি ও জাতীয়তাভিত্তিক সংহতি সুপ্ত আছে বলে দাবী করা হয়, সব বোগাস! সম্প্রীতি-সংহতি কিচ্ছু না! এখানে ভিন্ন গভীর দূরভিসন্ধী আছে! তা হল, কিছু ভদ্র বিশেষণের মাধ্যমে চোখে ধুলো দিয়ে বিধর্মীদের সংস্কৃতি বা ধর্মহীনতা শুধুমাত্র ইসলাম ও মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া। টার্গেট কেবল ইসলাম! নতুবা ওদেরকে কখনো দেখেছেন, সামাজিক ও গোষ্ঠিগতভাবে আমাদের কোন উৎসব বরণ করে নিতে। আমরাও তো আবহমান কাল থেকে গরু জবাই করে আসছি। আমরা কি বাঙলার মানুষ নই! তাহলে আমাদেরটা ইসলামের উর্ধ্বে এসে আবহমানকালের বাঙ্গালি সংস্কৃতি হিসেবে মেনে নেয়া হচ্ছে না কেন? গরু জবাইকে কেন গো-হত্যা ও ইসলামের বর্বরতা হিসেবে হাইলাইট করা হচ্ছে? স্টার কাবাবে বড় করে 'নো বীফ' লেখা থাকে। চারুকলায় সম্প্রতি গরুর গোশতের তেহারী পরিবেশনকে কেন্দ্র করে ভাঙচুর হয়েছে। নতুন সংবাদে জানা গেছে ভারতে গরু জবাই হলে আড়াইলাখ টাকা জরিমানা। এখানে আবহমানকাল, সর্বজনীনতা বা ধর্মনিরপেক্ষতা কোথায় গেলো?

তিন. মঙ্গল শোভাযাত্রা কি মঙ্গল কামনায় বের হয়? আমি সঠিক জানি না। যদি মঙ্গল কামনাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে প্যাঁচা, হাতি, ময়ূর, কুমির, বাঘের প্রতিকৃতি, ভৌতিক মুখোশ, প্রদীপ, আল্পনা এসব কেন? আমার তালাশ ও অনুসন্ধানের দৌড় যেখানে শেষ সেখান থেকে বলছি, এখানে যে প্রাণীগুলোর প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা হচ্ছে, কোন যোগবিয়োগ ও ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিটি প্রতিকৃতি থেকেই হিন্দুত্বের কাঁচা গন্ধ আসে। প্রতিটি প্রতিকৃতিই কোন না কোন দেব/দেবীর বাহন। তাহলে আমি কিভাবে ধরে নেবো, এই প্রতিকৃতিগুলো স্রেফ যাত্রার শোভাবর্ধনের জন্য নেয়া হয়েছে! কিভাবেই বা মেনে নেবো, এখানে হিন্দুদের মঙ্গল কামনার পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে না! যদি দেবদেবীর বাহনের বাইরে এক-দু'টি প্রাণীও থাকতো, ধরুন, যদি তারা কিছু তেলাপোকা, মশা-মাছি ইত্যাদির প্রতিকৃতিও সাথে রাখতো তাহলেও হয়তো মেনে নেয়া কিছুটা সহজ হতো। আমি জানি, আমার এহেন বিশ্লেষণে মোটেই তর্ক মিটবে না। বরং বাড়বে। কারণ সেক্যুলাররা যুক্তির মেশিন নিয়ে চলাফেরা করেন। তাই তর্কের পথ এড়িয়ে মেনে নিচ্ছি, এসব প্রতিকৃতিতে কোন ধরনের হিন্দুত্বের ছিটেফোঁটা নেই। কিন্তু সবকিছু বাদ দিলেও মোটাদাগে এই প্রশ্ন থেকেই যায় যে, এই প্রতিকৃতি ও প্রদীপের মাধ্যমে কোন্ মঙ্গল অর্জন হবে? আর একটি শোভাযাত্রাই বা কি করে মঙ্গল আনয়নে ভূমিকা রাখতে পারে?

আসলে মঙ্গল আনয়নের সম্মিলিত আয়োজন মনুষ্য-প্রকৃতি। এটা জেনেই ইসলাম আমাদের জন্য সম্মিলিত কল্যাণ-কামনার তরীকা বাতলে দিয়েছে। নামায, হ্যাঁ, নামাযই হলো মুসলমানদের মঙ্গল শোভাযাত্রা। অনাবৃষ্টিতে দলেদলে মাঠে জমা হও। তারপর ইস্তেস্কার নামায পড়ে পরম অনুনয়ে আসমানে হাত তোল। দেখো কী তৃপ্তি! জাতীয় বিপদে মসজিদে মসজিদে কুনুতে নাযেলা পড়! আরও পড়তে পারো সালাতুল কুসুফসহ সংশ্লিষ্ট মঙ্গলের জন্য ইসলাম যে সম্মিলিত আয়োজন রেখেছে। কী দরকার বাঘ-ভল্লুক মাথায় শোভাযাত্রায় বের হয়ে ইজ্জত আব্রু নষ্ট করার! কী দরকার দিবসটিকে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতায় পর্যবসিত করে দেশকে ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে ফেলবার?

চার. মঙ্গল শোভাযাত্রায় প্রার্থনা থাকুক বা না থাকুক, উৎসব অবশ্যই আছে; কথিত সর্বজনীন বর্ষবরণ উৎসব। একটি প্রার্থনায় থাকে কৃতজ্ঞতাবোধ, থাকে ন্যূনতম বিশ্বাস। তেমনি একটি উৎসবও কৃতজ্ঞতাবোধের রেশ ও ন্যূনতম বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারে না। চাই সেই উৎসব নাস্তিকের হোক বা আস্তিকের।

উপরন্তু একটি উৎসব ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জাতিগত স্বকীয়তার বৃহৎ প্রকাশ ঘটায় এবং ধর্মীয় সংহতি, রুচি-প্রকৃতি, নৈতিক সৌন্দর্য ইত্যাদি পৃথিবীর সামনে ফুটিয়ে তোলে। এই কারণে উৎসব পালনে একটি জাতি কখনো অন্য জাতির পন্থা ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে না। উদাহরণত বিবাহোৎসব। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সবারই বিবাহোৎসব আছে। কিন্তু কখনো কোন হিন্দু বা খ্রিস্টানকে দেখেছেন, তারা তাদের বিবাহোৎসবে খুতবা, খুরমা, মহর, হুযূর ও ইসলামী তরীকায় সম্মিলিত মুনাজাত ইত্যাদি প্রথা অনুসরণ করেছে? তদ্রূপ মুসলমানরা কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু গানবাদ্য করলেও কখনো দেখেছেন, তাদের বিবাহে খুরমা, খুতবা বিবর্জিত হয়েছে? হয়নি, বরং উৎসবে ধর্মীয় মৌলিকত্ব সবাই ধরে রাখছে। এবং ধরে রাখা অবশ্যকর্তব্যও বটে। আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসব প্রদানের ক্ষেত্রে ধর্মের জোরালো বিবেচনা রেখেছেন। এবং ভিন্ন ধর্মের সাদৃশ্য থেকে আমাদের উৎসবকে বাঁচাতে বলেছেন। এরপরে আর সার্বজনীনতার নাম দিয়ে উৎসবকে ধর্মের উর্ধ্বে তোলার সুযোগ থাকে কোথায়? আর উৎসবকে যদি ধর্মের উর্ধ্বে তোলা না যায় তাহলে ওদের অর্থে সার্বজনীনতারও কোন অস্তিত্ব থাকে না। চাই সে দাবীকৃত সার্বজনীনতা আবহমানকাল থেকে হোক অথবা ১৯৮৯-এ জন্মলাভ করুক। অন্তত ইসলামের মত একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থায় এহেন ধর্মহীন সার্বজনীনতা একটি অলীক, অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তব চিন্তা বৈ কিছু নয়। সুতরাং মঙ্গল শোভাযাত্রার মত একটি স্পষ্ট হিন্দুয়ানী প্রথাকে পুরো পৃথিবী আবহমানকালের সর্বজনীন সংস্কৃতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দিক, আমরা ধর্মভীরু মুসলমানরা বিনাতর্কে এই স্বীকৃতিকে প্রত্যাখ্যান করব।

মঙ্গল শোভাযাত্রার সার্বজনীনতা শুধু ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক দায়বোধ থেকেই যে প্রত্যাখ্যাত তা নয়। বরং ঐতিহাসিকভাবেও প্রত্যাখ্যাত। কবি জসিমুদ্দীন তাঁর 'জীবন কথা' গ্রন্থে হিন্দু মুসলিম সবার জন্য কোন সর্বজনীন উৎসব নেই বলে আক্ষেপ করেছেন এবং কোনও একটি উৎসবকে সর্বজনীন করার প্রস্তাব করেছেন। যদি বর্ষবরণ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা আবহমানকাল থেকেই সর্বজনীন হতো, তাহলে এই প্রস্তাবের কোন মানে হয় না। বাংলাদেশে সর্বজনীন কোন সংস্কৃতি-উৎসবের অস্তিত্ব আছে কিনা তা কবি জসিমুদ্দীনের চেয়ে কে বেশি জানবে? তার 'জীবন কথা'র পুরোটাই তো উৎসবের বিবরণে ভরা। সেখানে বর্ষবরণ নামে কোন উৎসবের কথা নেই।

শেষ কথা, আমাদের কোন নববর্ষ নেই। মুসলমানের জীবনে প্রতিটি দিনই নববর্ষ। হযরত আলী রাযি. বলতেন, নওরযুনা কুল্লা ইয়াওম। তবু যারা না বুঝে নববর্ষ উদযাপন করছে, তাদের সেই উদযাপনে বিধর্মীদের সাদৃশ্য ও পদ্ধতি অনুসরণ কতোটা ভয়াবহ! বিধর্মীরা তো কোন ক্ষেত্রে আমাদের সাদৃশ্যে আসছে না। তাহলে আমরা কেনো তাদের সাদৃশ্যপূর্ণ উৎসবে অংশগ্রহণ করে স্বকীয়তা নষ্ট করবো! এমনটি করা ছিঁচকেমি, আভিজাত্য পরিপন্থী। তার চেয়ে সুযোগ থাকলে এসব দিবসে পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সময় কাটান অনেক ভালো লাগবে।

লেখক : শিক্ষার্থী, ফাতাওয়া বিভাগ,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

কিশোর প্রতিভা

মায়ের অবাধ্যতার প্রতিফল

গত রমাযানের কথা। চতুর্থ বা পঞ্চম রোযা চলছিল। দুপুর গড়িয়ে বিকাল ছুঁই ছুঁই। রোযা রেখে শরীরটা কেমন ভার ভার লাগছিল। মাদরাসার বারান্দায় এক সাথী ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। আমার একজন প্রিয় উস্তাদ মাওলানা ইউনুস সাহেব এসে বললেন, 'নাজমুল! তোমার রক্তের গ্রুপ কি এ.বি পজেটিভ?' বললাম, 'জ্বী, আমার রক্তের গ্রুপ এ.বি পজেটিভ। মনে হয় এ রক্ত সহজে পাওয়া খুব মুশকিল।' তিনি বললেন, 'হুম, তুমি ঠিক বলেছ, এ রক্ত সহজে পাওয়া বড় মুশকিল। আর এ রক্ত অনেক দামী রক্ত। তুমি কি কাউকে তোমার এ দামী রক্ত দান করবে? অমুক হাসপাতালে আমার এক রোগী আছে, তার রক্তের খুব প্রয়োজন।' আমি বললাম, 'ইনশাআল্লাহ'। তারপর বাড়িতে ফোন করে মাকে বিষয়টি জানালাম। 'না, তুমি রক্ত দিতে যাবে না' বলে মা সাফ নিষেধ করে দিলেন। রক্তদান শরীয়তসম্মত হওয়ায় মায়ের বারণ না শুনেই হাসপাতালে হাজির হলাম।

সবকিছু প্রস্তুত। এখনই রক্ত পরীক্ষা করা হবে; এরপর রক্ত দিয়ে মাদরাসায় ফিরে আসবো। কিন্তু একি! রক্ত পরীক্ষার সময় ঘটল এক আজব কাণ্ড। এতোদিন পর্যন্ত আমি জানি রক্তের গ্রুপ এ.বি পজেটিভ কিন্তু এখন দেখি বি পজেটিভ! ভীষণ অবাক হলাম। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না! আমি বললাম, 'এটা অসম্ভব'। চিকিৎসকেরা আরও একবার পরীক্ষা করলেন। কিন্তু ফলাফল সেই একই। রক্ত আর দেয়া হল না। খুব লজ্জা পেলাম। কিছুদিন পর সন্দেহ দূর করার জন্য রহমত ব্লাড ব্যাংক থেকে পরীক্ষা করে দেখলাম রক্তের গ্রুপ আগের মত এ.বি পজেটিভই আছে। এবার বুঝলাম, মাঝের ওই ব্যাপারটা ছিল মায়ের কথা অমান্য করার ফল। শপথ করেছি, আর কখনো বড়দের কথার অবাধ্য হবো না।

মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম ফরিদপুরী
জামি'আ ইলয়াসিলা ইসলামিয়া, ঢাকা

ঐক্যের অপূর্ব এক দৃশ্য

জুমু'আ বার। সূর্যের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা রওয়ানা হলাম দাওয়াতুল হকের বার্ষিক সম্মেলনে যাত্রাবাড়ীর দিকে। যেখানে উলামা-তুলাবা, পীর-মাশাইখ দেশের শীর্ষ হক্কানী মুরুব্বীগণ একত্রিত হবেন। সম্মেলনে পৌঁছে প্রথমে নাস্তা সেরে নিলাম। তারপর উযূ করে ইশরাকের নামায আদায় করলাম এবং মজলিসে বসে গেলাম।

মজলিস শুরু হল, বয়ান চলছে। দেখতে পেলাম উলামায়ে কেরামের ঐক্যের এক অপূর্ব দৃশ্য। বয়ান চলছে একের পর এক। হৃদয়ে প্রভাব ফেলে এমন সব বয়ান। আমরা হৃদয়ের কানে তা শুনছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন সকলে একই সুতোয় গাঁথা। একই বন্ধনে আবদ্ধ। যাতে নেই কোন ভাঙ্গন, নেই কোন বিদ্বেষ।

আমীরুল উমারা আল্লামা মাহমূদুল হাসান দা.বা. বারবার বলছিলেন, 'কে বলে আলেমদের মাঝে ঐক্য নেই। দেখে যাও, ঐক্যের অপূর্ব এই দৃশ্য'।

সারাদিন দেশবরেণ্য ও নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরাম বয়ান করলেন। মজার ব্যাপার হল, ইশার নামাযের পূর্বে বাংলাদেশের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগমন করেন এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণও দেন, যে ভাষণে তিনি মাদারিসে কওমিয়্যার ভূয়সী প্রসংশা করে বিরোধীদের অপপ্রচারের দাঁতভাঙ্গা জবাবও প্রদান করেন।

দেখতে দেখতে অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। দু'আর শুভক্ষণ নিকটবর্তী হল। শুরু হল দু'আ। চারিদিকে কান্নার রোল। কান্নার আওয়াজে মনে হচ্ছিল যেন আসমান থেকে রহমতের বারি বর্ষিত হচ্ছে। আহা! কী চমৎকার সেই রোনাযারীর দৃশ্য। কত শ্রুতিমধুর সেই ধ্বনি।

দু'আ শেষ হল কিন্তু কান্নার শব্দ বন্ধ হয়নি। তাকিয়ে দেখি এক ব্যক্তি কাঁদার সুরে যিকির করছে। এক আশ্চর্য ভাবালুতায় দীপ্ত তার মুখ! আল্লাহু আকবার! এটাইতো খোদাপ্রেমিকদের প্রেমের হালাত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর দরবারে বেশি বেশি কাঁদার তাওফীক দিন। আমীন।

মুহাম্মাদ মাযহারুল ইসলাম কিশোরগঞ্জী
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

হাসানের ঈদ ও রোযা

হাসান। বয়স মাত্র আট বছর। তার মা রহীমা খাতুন। স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেকে বুকে নিয়ে বেঁচে আছেন সাতটি বছর যাবত। ভোলা জেলার এক নিঝুম পল্লীতে মা ও ছেলের বসবাস। রহীমা খাতুন মানুষের বাড়িতে 'ঝি' এর কাজ করে যা পান তা দিয়ে দুঃখে-কষ্টে কোন রকম সংসার চলে যায়।

রমাযানের আর মাত্র একদিন বাকি। হাসান ঘুমানোর পূর্বে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল,

- মা আমাকে ভোর রাতে ডাক দিবেন; আমি আপনার সাথে রোযা রাখব।

ভোর রাতে হাসানের মা ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করে হাসানকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তাকে নিয়ে খেতে বসেন। হাসানের খানা খেতে যেন কষ্ট না হয়, সেজন্য তিনি আগে থেকেই একটি ডিম ভাজি করে রেখেছেন। হাসান ভাত-ভর্তা আর ডিম ভাজি দিয়ে খানা শেষ করে। কিছুদিন হল সে মায়ের কাছ থেকে কুরআন পড়া শিখেছে। ফজরের নামায শেষে সে তার মাকে তিলাওয়াত শুনাচ্ছিল। হাসানের মা জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছোট্ট নিষ্পাপ এই ছেলের পড়া শুনছে আর স্বামীর কথা মনে হওয়ায় চোখ দিয়ে নীরব পানি ঝরছে। হাসান তার মায়ের চোখের পানি দেখে ফেলল।

- মা তুমি কাঁদছো কেন?

- না তো বাবা! কাঁদছি না।

হাসানের মা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ঝি এর কাজে চলে গেলেন। হাসান বাসায় সারাটা দিন মায়ের কথা ভেবে একাকী সময় কাটাল। বিকালে রহীমা খাতুন বাড়িতে ফিরে আসেন। হাসানকে দেখামাত্রই সব দুঃখই তিনি ভুলে যান। সন্ধ্যায় মা ও ছেলে কিছু মুড়ি ও সামান্য ছোলা-বুট দিয়ে ইফতার শেষ করল।

পুরো রমাযানে হাসান তার মায়ের সাথে মাঝে মাঝে রোযা রাখত। একদিন ইফতারের সময় হাসান তার মা'কে বলল,

-মা! আমরা প্রতিদিন সাহরীতে ভাত আর ভর্তা খাই। আর ইফতার শুধু মুড়ি আর ছোলা-বুট দিয়ে করি। অথচ আমাদের পাশের বাড়ির শফীকেরা সাহরীতে মাছ-মুরগী আর ইফতারীতে কত রকম ফল আরো কত কিছু খায়! তুমি কি সেগুলো আনতে পারো না? আমার যে প্রতিদিন এক খাবার ভালো লাগে না!

ছেলের আবদার শুনে রহীমা খাতুন চোখের অশ্রু আর ধরে রাখতে পারলেন না। বললেন,

- ঠিক আছে বাবা! আমি তোমার জন্য মজার খাবারের ব্যবস্থা করব।

কিন্তু রহীমা খাতুন পুরো রমাযান মাসে ছেলের জন্য ভালো কোন খানার ব্যবস্থা করতে পারলেন না। কী করেই বা পারবেন, তার যে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। সামান্য ঝি এর কাজ করে সংসারই সে ঠিকমত চালাতে পারে না! আবার কি করে মজার খাবার ক্রয় করবেন!

ঈদের আর মাত্র একদিন বাকি। হাসানের মা'র চিন্তা বেড়েই চলছে। ছেলের জন্য ঈদের জামা ক্রয় করবেন কিভাবে? তার কাছে যে আট আনা পয়সাও নেই! হাসান যে ঈদের জামার বায়না ধরবে। প্রতিদিন তাকে শুধু বলে আসছে, কিছুদিনের মধ্যে আমি তোমার নতুন জামা আনব।

ঈদের দিন সকাল বেলা। হাসান তার মা'কে বলল,

- মা! আমার ঈদের জামা?

- বাবা! আমি যে তোমার ঈদের জামা কিনতে পারিনি! চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কথাটি বললেন হাসানের মা।

হাসান অবুঝ মনে মায়ের কান্না দেখে বলে উঠল,
- মা! আমার ঈদের জামা লাগবে না; তবুও তুমি কেঁদ না। সবাই ঈদগাহে নতুন জামা পরে যাবে। আমি না হয়, না-ই গেলাম। তবুও আমি খুশি। তুমি কেঁদ না মা, তুমি কেঁদ না। তুমি কাঁদলে আমার যে কষ্ট হয়।
ছেলেকে বুকে জড়িয়ে তিনি চোখের পানিতে বুক ভাসান।
আজ যারা দরিদ্র মানুষের আর্তনাদ শুনে কান বন্ধ করে রাখে, দেখেও না দেখার ভান করে, তারাও একদিন কাঁদবে। কিন্তু তখন কেউ তাদের কান্না শুনবে না।

মুহাম্মাদ ওয়ালীউল্লাহ
মিরপুর-১০, ঢাকা

আজো মনে পড়ে

২০১২ সাল। আমি তখন নাহেরা বিভাগে পড়ি। কুরবানীর বন্ধের একদিন বাকি। ভাইয়া এসে বললেন, চলো, বছিলা যাবো। আমি তো বেজায় খুশি। ভাইয়া হুযূরের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এলেন। ভাইয়া বললেন, একটু দাঁড়াও এক চাচাজান এসে আমাদেরকে নিয়ে যাবেন। একটু পরই চাচাজান আসলেন। আমাদের দুই ভাইকে তার বাইকে করে নিয়ে গেলেন বছিলা। আমি তো খুব খুশি। কিন্তু সামনে আমার জন্য যে কঠিন দুঃখ অপেক্ষা করছে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমি সেসব কথা শোনার জন্য এবং দেখার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না।
বাড়ির গেটে পা রাখলাম। কানে ভেসে এলো বাঁধভাঙ্গা কান্নার আওয়াজ। বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। তখনো বুঝতে পারিনি কী হয়েছে? দৌড়ে গেলাম ঘরের দিকে। দেখলাম ঘরের ভিতরে মহিলারা বসে বসে কাঁদছে। তাদের সবার মাঝে একটি খাটিয়ায় কাফনে জড়ানো একটি লাশ। মা আমার দিকে দৌড়ে এসে বললেন, বাবা! তোমার দাদী আর নেই! আল্লাহর কাছে চলে গেছেন, আর ফিরে আসবে না। আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না। শুধু বললাম, ইন্না- লিল্লাহি ওয়াইন্না- ইলাইহি রাজিউন। হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলাম। কাঁদতে কাঁদতে একেবারে বসেই পড়লাম। আর ভাইয়া তো দেয়ালের সাথে টেক লাগিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন।
বাইরে চেয়ারে বসে আছি। আমার পাশে তিনজন যুবক বসে আছে। কী আশ্চর্য! এমন দুঃখের দিনেও তারা হাসাহাসি করছে! মনে মনে আমার খুব রাগ হচ্ছিল। এমন সময় আব্বু এলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে তিনিও কাঁদছেন। জড়ানো কণ্ঠে শুধু বললেন, আব্বু তোমাদ দাদীর জন্য দু'আ করো।
ভাইয়া দাদীর জানাযা নামায পড়ালেন। এরপর আমরা দাদীর দাফন কাজ শেষ করলাম। আজিমপুর কবরস্থানে কবর দিলাম। দাদী আমাকে খুব আদর করতেন। আমার আজো মনে পড়ে দাদীর কথা। হে আল্লাহ! আপনি আমার দাদীকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আলী (হিফয)
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

আল্লাহ! আমার নানুকে জান্নাত নসীব করো

সোমবার। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬। সকাল থেকেই থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল। এখানে সেখানে পানি আর থকথকে কাদা। ফজরের পর কুরআন তিলাওয়াত করে সেই যে ঘুমিয়েছি, উঠে নাস্তা করে বই নিয়ে বসব এমন সময় ভেসে এলো যোহরের আযান। নামায শেষে নানুর কথা ভাবছিলাম। অসুখ বিসুখে ভুগেভুগে নানু আমার কয়েক মাস ধরেই শয্যাশায়ী। আম্মু এসে বলল, ব্যাগ গুছিয়ে নাও, তোমার নানু বাড়ি যাবো। কয়েকদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম আম্মুর মনটা ভালো নেই। এজন্য কোন কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। মনের ভেতরটা কেমন যেন খুঁতখুঁত করছিল, নানুর আবার কিছু হয়নি তো! নানুবাড়ি যাওয়ার কথা ছিল আগামীকাল তাহলে আজ কেন? প্রশ্নটি মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল বারবার। একটু পর আম্মুকে খুঁজতে গেলাম রান্নাঘরে। দেখি, মেজো আপু মাছ কাটছে। জানতে চাইলাম কী হয়েছে? বলল, নানু বারবার কেমন যেন করছে। যাও বোরকা পরে নাও, এক্ষুণি রওয়ানা হব।
আসরের সময় হয়ে গেছে। নামায পড়ে নিলাম। আম্মু ইতোমধ্যে বোরকা পরে নিয়েছেন। আমাকেও পরতে বললেন। এবার একটু সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে আম্মু! কোন খারাপ খবর! আম্মু বললেন, না, চলো যাই, যা হওয়ার হবে।
বিকেল পাঁচটা। সন্ধ্যা হতে এক ঘণ্টা বাকি। এই কাদাপানি মাড়িয়ে পথে বেরোতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু নানুর অবস্থা ভালো না, তাই রওয়ানা হলাম। আমাদের বাড়ি গ্রামের একটু ভেতর দিকে; প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে এসে গাড়িতে উঠতে হয়। গাড়ি থেকে নেমে আরো দেড় কিলোমিটার হেঁটে নানু বাড়িতে পৌঁছলাম। অন্যান্য সময় নানুবাড়ি আসতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু এবার তেমন ক্লান্তি অনুভব করিনি। মাগরিবের সময় বেশি বাকি নেই। তাই আগে নামায পড়ে তারপর নানুর কাছে গেলাম। নানু আগের মতই বিছানায় পড়ে আছেন নীরব নিথর। মাঝে মধ্যে একটু আধটু শব্দ করেন। ইশার আযান হলে নামায পড়ে নানুর কাছে এলাম। সেজো মামী খেতে ডাকলেন। খেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু মামী জোর করে বসিয়ে দিলেন।
আমার খাওয়া শেষ। আম্মু কেবল খাওয়া শুরু করেছেন। এমন সময় শুনলাম, সবাই জোরে জোরে কালিমা পড়ছে। আম্মু খাওয়া রেখেই উঠে গেলেন। অনেক মানুষ ছিল ভেতরে। তাই যাওয়া সম্ভব হল না। আমার এক খালাতো ভাই নানুর কাছে বসে সূরা আন'আম পড়ছিল।
হঠাৎ নানুর শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেল। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল এই বুঝি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। এরই মধ্যে একটু চোখ খুলে তাকালেন এবং কাঁদার মত করে আবার চোখ বুজে ফেললেন। আর চোখ খুললেন না। সূরা আনআম পড়া শেষ হল আর নানুও দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। রাত তখন ১১ টা বেজে ৪০ মিনিট।
নানু নেই শুনে আকাশটা যেন ভেঙ্গে পড়ল মাথার উপর। ঘরে গিয়ে নানুকে দেখলাম। মনে হচ্ছিল নানু নূরমাখা চেহারায় হাসছেন। যেন এখনই চোখ খুলে তাকাবেন এবং আগের মতই আমাদেরকে ডাকবেন। কিন্তু নানু তো আর নেই আমাদের মাঝে। চলে গেছেন নশ্বর এই পৃথিবী ছেড়ে; দূরে, বহু দূরে। আগে কোনদিন সরাসরি মৃত মানুষ দেখিনি। এই প্রথম নানুকে দেখলাম।
পরদিন সকাল। প্রচণ্ড বৃষ্টি। নানুকে গোসল দেয়া হল। এরপর কাফন পরিয়ে জানাযার জন্য নিয়ে যাওয়া হল। এমন প্রচণ্ড বৃষ্টিতেও বহু মানুষ নানুর জানাযায় শরীক হয়েছিলেন। পরে যখন কবর দেখতে গেলাম মনে হল একদিন আমাকেও নানুর মত চলে যেতে হবে।
আল্লাহ! তুমি আমার নানুকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করো। আমীন।

আমাতুর রব সালসাবীল তাশফিয়া
স্বপ্নধারা হাউজিং, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

দ্বি-মাসিক রাবেতায় লেখা পাঠানোর ঠিকানা

রাবেতা কার্যালয়

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
ই-মেইলঃ rabetaar@gmail.com

- - - - মোবাইল - - - -

০১৮২৬৬২১৬৬৯, ০১৯২৭৩২৪৬৪৭, ০১৯১২০৭৪৪৯৫